Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন গঙ্গারিডাই ও দুর্গনগরী থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৬ সালের আধুনিক রূপান্তরের এক প্রামাণ্য ২০ খণ্ডের ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

SHAKIL MAHMUD

গবেষক ও লেখক

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন গঙ্গারিডাই ও দুর্গনগরী থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৬ সালের আধুনিক রূপান্তরের এক প্রামাণ্য ২০ খণ্ডের ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Title: বাংলার ইতিহাস
Author: Shakil Mahmud
Series: Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
Subjects: Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
Published: Dhaka & Singapore, 2026
Format: Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
Permanent URI: https://shakilmahmud.com/series/bengal/

প্রস্তাবিত সাইটেশন:
Mahmud, Shakil. (2026). *বাংলার ইতিহাস: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/bengal/

Open Scholarly Access: This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পলিগঠিত বঙ্গভূমি প্রাচীনকাল থেকেই নৌ-বাণিজ্য, জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও মুক্তিসংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। প্রাগৈতিহাসিক গঙ্গারিডাই ও মহাস্থানগড় থেকে শুরু করে সুলতানি স্বর্ণযুগ, উপনিবেশবিরোধী লড়াই, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপান্তরের প্রামাণ্য ইতিহাস।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

— Shakil Mahmud
Dhaka & Singapore, 2026

অধ্যায় সূচি

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ প্রাচীন উষালগ্ন — প্রাগৈতিহাসিক শিকড়, প্রাচীন জনপদ এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য — 749 শব্দ
প্রাচীন উষালগ্ন — প্রাগৈতিহাসিক শিকড়, প্রাচীন জনপদ এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য

খণ্ড ২ ধ্রুপদী সাম্রাজ্য ও নগরকেন্দ্র — মহাস্থানগড়, মৌর্য যুগ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য — 694 শব্দ
ধ্রুপদী সাম্রাজ্য ও নগরকেন্দ্র — মহাস্থানগড়, মৌর্য যুগ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য

খণ্ড ৩ সার্বভৌমত্বের উন্মেষ — গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক এবং মাৎস্যন্যায়ের অন্ধকার — 699 শব্দ
সার্বভৌমত্বের উন্মেষ — গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক এবং মাৎস্যন্যায়ের অন্ধকার

খণ্ড ৪ পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ — গোপালের নির্বাচন, সোমপুর মহাবিহার এবং বাংলা ভাষার জন্ম — 737 শব্দ
পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ — গোপালের নির্বাচন, সোমপুর মহাবিহার এবং বাংলা ভাষার জন্ম

খণ্ড ৫ সেন রাজবংশ — ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণ, কৌলীন্য প্রথা এবং রাজদরবারের সাহিত্য — 584 শব্দ
সেন রাজবংশ — ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণ, কৌলীন্য প্রথা এবং রাজদরবারের সাহিত্য

দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ তুর্কি বিজয় ও প্রারম্ভিক মুসলিম শাসন — বখতিয়ার খলজি, লখনৌতি এবং সুফি সাধকগণ — 627 শব্দ
তুর্কি বিজয় ও প্রারম্ভিক মুসলিম শাসন — বখতিয়ার খলজি, লখনৌতি এবং সুফি সাধকগণ

খণ্ড ৭ স্বাধীন বাংলা সালতানাত — ইলিয়াস শাহী বংশ, আদিনা মসজিদ এবং "বাঙ্গালাহ্"র ঐতিহাসিক জন্ম — 765 শব্দ
স্বাধীন বাংলা সালতানাত — ইলিয়াস শাহী বংশ, আদিনা মসজিদ এবং "বাঙ্গালাহ্"র ঐতিহাসিক জন্ম

খণ্ড ৮ সালতানাতের স্বর্ণশিখর — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় — 720 শব্দ
সালতানাতের স্বর্ণশিখর — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়

খণ্ড ৯ বারো ভূঁইয়া ও মুঘল বিজয় — ঈসা খাঁ, নদীমাতৃক যুদ্ধ এবং ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার পত্তন — 661 শব্দ
বারো ভূঁইয়া ও মুঘল বিজয় — ঈসা খাঁ, নদীমাতৃক যুদ্ধ এবং ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার পত্তন

খণ্ড ১০ সুবাহ বাংলা — বিশ্ববাণিজ্যের পরাশক্তি এবং "জান্নাতুল বিলাদ" বা ভূস্বর্গ — 803 শব্দ
সুবাহ বাংলা — বিশ্ববাণিজ্যের পরাশক্তি এবং "জান্নাতুল বিলাদ" বা ভূস্বর্গ

তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ বাংলার স্বাধীন নবাব ও পলাশীর ট্র্যাজেডি — মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ — 1,016 শব্দ
বাংলার স্বাধীন নবাব ও পলাশীর ট্র্যাজেডি — মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭

খণ্ড ১২ কোম্পানির শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ — 967 শব্দ
কোম্পানির শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ

Shakil Mahmud • Research Monograph

খণ্ড ১৩	বাংলার নবজাগরণ — বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয়ী পথিকৃৎ *বাংলার নবজাগরণ — বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয়ী পথিকৃৎ*	835 শব্দ
খণ্ড ১৪	১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব — মাস্টারদা থেকে নেতাজি *১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব — মাস্টারদা থেকে নেতাজি*	840 শব্দ
খণ্ড ১৫	মহাপ্রলয়ঙ্কর দশক — ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগ *মহাপ্রলয়ঙ্কর দশক — ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগ*	888 শব্দ

চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

খণ্ড ১৬	পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিকুণ্ড — ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা *পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিকুণ্ড — ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা*	1,053 শব্দ
খণ্ড ১৭	মুক্তির দ্বারপ্রান্তে — ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ব্যালট বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ *মুক্তির দ্বারপ্রান্তে — ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ব্যালট বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*	904 শব্দ
খণ্ড ১৮	মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ — অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা এবং লাল-সবুজের মহাবিজয় *মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ — অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা এবং লাল-সবুজের মহাবিজয়*	1,005 শব্দ
খণ্ড ১৯	যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম (১৯৭২–২০০০-এর দশক) *যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম (১৯৭২–২০০০-এর দশক)*	912 শব্দ
খণ্ড ২০	মেগা-অবকাঠামো, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং ২০২৬-এর দিগন্ত *মেগা-অবকাঠামো, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং ২০২৬-এর দিগন্ত*	850 শব্দ

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

প্রাচীন উষালগ্ন — প্রাগৈতিহাসিক শিকড়, প্রাচীন জনপদ এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য

প্রাচীন উষালগ্ন — প্রাগৈতিহাসিক শিকড়, প্রাচীন জনপদ এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য

749 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১: *চিত্র: উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক খননকেন্দ্রের প্রাচীন নিদর্শন ও মাটির প্রকোষ্ঠ (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতক), যা প্রাচীন বঙ্গোপসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নগর সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে।*

একটি সুসংহত রাজনৈতিক ভূখণ্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশের বহু পূর্বেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পলিগঠিত বদ্বীপ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাগৈতিহাসিক মানববসতির এক অনন্য পদচিহ্ন। পলল সঞ্চয়ন ও নদ-নদীর অবিরাম পথবদলের ভেতর দিয়ে প্রাচীন বাংলা কোনো বিচ্ছিন্ন পশ্চাদপদ জনপদ ছিল না। গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে পাওয়া যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহামতি আলেকজান্ডার যখন পাঞ্জাবের বিপাশা (হাইফ্যাসিস) নদীর তীরে উপস্থিত হন, তখন তাঁর বিশ্বজয়ী ম্যাসেডোনীয় সৈন্যবাহিনী পূর্বের এক অপরাজেয় সামরিক শক্তির কথা শুনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—সেই পরাক্রমশালী শক্তি ছিল ‘গঙ্গারিডাই’ (Gangaridai), যারা গঙ্গার মোহনায় চার সহস্র যুদ্ধহস্তীর সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে পাহারারত ছিল।

১. ভূতাত্ত্বিক গঠন ও প্রাগৈতিহাসিক শিকড়

বাংলার ঐতিহাসিক বিবর্তন তার অনন্য বদ্বীপ প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পদ্মা (গঙ্গা), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনা—এই তিন সুবিশাল নদীপ্রণালীর পললধারায় গড়ে ওঠা বেঙ্গল বেসিন পৃথিবীর বৃহত্তম সক্রিয় বদ্বীপ। এই নদীমাতৃক ভূপ্রকৃতি মূলত প্রাচীন প্লাইস্টোসিন বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর গড় এবং নবীন উর্বর পলিমাটির প্লাবনভূমিতে বিভক্ত।

Shakil Mahmud • Research Monograph

পশ্চিমবঙ্গের সুসুনিয়া পাহাড় ও দেওজালি হাডিং এবং বাংলাদেশের লালমাই-ময়নামতি ও সীতাকুণ্ড পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাপ্ত জীবাশ্ম-কাঠের তৈরি প্রাচীন প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের কুঠার, বাটালি এবং চাঁচনি প্রমাণ করে যে হাজার হাজার বছর পূর্বেই এই বঙ্গীয় বদ্বীপে শিকারী ও প্রাথমিক কৃষিভিত্তিক মানবগোষ্ঠী সাফল্যের সাথে জীবনধারণ করত।

২. প্রাচীন জনপদ: আঞ্চলিক পরিচয়ের সূচনা

বৈদিক সাহিত্যে বাংলাকে আর্যাবর্তের মূল ভূখণ্ডের বাইরের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে দেখা হতো। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ ‘বঙ্গ’ ও ‘মগধ’ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে প্রাচীন বাংলা কতগুলো স্বাধীন জনপদে বিভক্ত হয়ে পড়ে:

- **বঙ্গ:** মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় প্লাবনভূমি (বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা)। নৌচালনা, নদীমাতৃক বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী হিসেবে এই জনপদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।
- **পুণ্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন):** উত্তরবঙ্গ (বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী)। পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) ছিল এর সমৃদ্ধ রাজধানী দুর্গনগরী। কৃষিজ প্রাচুর্য ও নগর সভ্যতায় এটি ছিল অগ্রগণ্য।
- **গৌড়:** ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা (মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম)। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এই গৌড়।
- **রাঢ়:** ভাগীরথী নদীর পশ্চিমের পাহাড়ি ও রুক্ষ ভূখণ্ড। জৈনদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ *আচারাঙ্গ সূত্র*-এ উল্লেখ রয়েছে তীর্থঙ্কর মহাবীরের রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা।
- **সমতট ও হরিকেল:** মেঘনা নদীর পূর্ব তীরের উপকূলীয় অঞ্চল (কুমিল্লা, নোয়াখালী) এবং হরিকেল (সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল), যা প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যে যুক্ত ছিল।

৩. কিংবদন্তি গঙ্গারিডাই ও আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তন

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে ঝিলামের যুদ্ধে রাজা পুরুকে পরাজিত করার পর মহামতি আলেকজান্ডার গঙ্গা অববাহিকার দিকে অগ্রসর হতে উদ্যত হন। কিন্তু বিপাশা নদীর তীরে এসে তাঁর অপরাজেয় সেনাবাহিনী আর এক পা-ও সামনে বাড়াতে অস্বীকৃতি জানায়। সৈন্যদের এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল পূর্বের মহাশক্তিধর **গঙ্গারিডাই** (Gangaridai / গঙ্গার রাষ্ট্র) সাম্রাজ্যের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর।

গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকুলাস, কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস এবং প্লুটার্ক তাঁদের গ্রন্থে এই ঘটনা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

> *“আলেকজান্ডার যখন নদী পার হওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান করলেন, তখন তাঁকে জানানো হলো যে নদীর ওপারে এক বিশাল সাম্রাজ্য রয়েছে, যার নাম গঙ্গারিডাই ও প্রাসিই। তাদের রাজা এক সুবিশাল বাহিনী নিয়ে অপেক্ষারত—যার মধ্যে রয়েছে বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই হাজার রথ এবং চার হাজার বর্মাবৃত রণহস্তী।”*
> — ***ডিওডোরাস সিকুলাস**, বিবলিওথেকা হিস্টোরিকা*

প্রাচীন নদীমাতৃক ভূখণ্ডে চার সহস্র রণহস্তী ছিল এক চলন্ত দুর্গ এবং আধুনিক কামানের মতো ধ্বংসাত্মক। ম্যাসেডোনিয়ার সেনারা বুঝতে পেরেছিল, এই জলাভূমি ও নদীময় বদ্বীপে এই গজবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া আত্মহত্যার শামিল। বাধ্য হয়ে আলেকজান্ডার বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে সিন্ধু নদীর পথ ধরে স্বদেশের উদ্দেশ্যে ফিরে যান।

৪. উয়ারী-বটেশ্বরের নগর বিস্ময়

দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা দাবি করতেন যে প্রাচীন বাংলায় নিজস্ব কোনো প্রাচীন নগর সভ্যতা ছিল না। নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় অবস্থিত **উয়ারী-বটেশ্বর**-এর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এই ঔপনিবেশিক ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত খননকার্যে জানা গেছে যে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন অববাহিকায় উয়ারী-বটেশ্বর ছিল এক সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক নদী ও সমুদ্রবন্দর দুর্গনগরী:

- **ছাঁচে-ঢালা ও ছাপযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা:** হাজার হাজার রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যা উন্নত অর্থনৈতিক লেনদেন ও রাষ্ট্রীয় মুদ্রাব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- **রুলেটেড মৃৎপাত্র ও পোড়ামাটির সিলমোহর:** যা ভূমধ্যসাগরীয় রোমান সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সাথে সরাসরি সংযুক্ত ছিল।
- **মূল্যবান পাথরের পুঁতি ও বাল্টিক অ্যাম্বার:** কোয়ার্টজ, কার্নেলিয়ান ও এগেটের তৈরি ৪০ হাজারেরও বেশি পুঁতি এবং সুদূর বাল্টিক সাগর থেকে আসা অ্যাম্বার প্রমাণ করে যে প্রাচীন বাংলা ছিল প্রাচীন সমুদ্র-সিল্ক রোডের অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র।
- **পরিখাবেষ্টিত নগর প্রাচীর:** মাটির প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত এই নগরীতে মিলেছে উন্নত লোহার কামারশালা ও বসবাসের পাকা মাটির ঘর।

দ্বিতীয় শতকে গ্রিক ভূগোলবিদ ক্লডিয়াস টলেমির মানচিত্রে উল্লেখিত বিখ্যাত নদীবন্দর *সোনাগৌরা* (Sounagoura)-ই আজকের এই উয়ারী-বটেশ্বর বলে আন্তর্জাতিক গবেষকরা মনে করেন। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, আড়াই হাজার বছর আগেই বাংলার মাটি ছিল এক উন্নত বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৪৩)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ১ম খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- রহমান, সুফি মোস্তাফিজুর (২০০৭)। *উয়ারী-বটেশ্বর: ইন সার্চ অব আর্লি হিস্টোরিক আরবানাইজেশন*। আইসিএসবিএ।
- চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার (২০০১)। *আর্কিওলজিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য গঙ্গা প্লেন*। পার্মানেন্ট ব্ল্যাক।
- ম্যাকক্রিন্ডল, জে. ডব্লিউ. (১৮৭৭)। *অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড বাই মেগাস্থিনিস অ্যান্ড অ্যারিয়ান*। ট্রুবনার।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রাচীন উষালগ্ন — প্রাগৈতিহাসিক শিকড়, প্রাচীন জনপদ এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-1-ancient-dawn-and-gangaridai-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

ধ্রুপদী সাম্রাজ্য ও নগরকেন্দ্র — মহাস্থানগড়, মৌর্য যুগ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য

ধ্রুপদী সাম্রাজ্য ও নগরকেন্দ্র — মহাস্থানগড়, মৌর্য যুগ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য

694 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ২: *চিত্র: মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর), বগুড়ার প্রাচীন সুবিশাল ইটের প্রাচীর ও দুর্গনগরী— উত্তর বাংলায় আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নগর প্রশাসনিক কেন্দ্র।*

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার বিক্ষিপ্ত জনপদগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের মহান সাম্রাজ্য কাঠামোর সাথে নিবিড়ভাবে একীভূত হয়। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত সুদৃঢ় দুর্গনগরী পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এই যুগে বাংলা কেবল একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছিল না, বরং তা পরিণত হয়েছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও প্রশাসনিক স্তম্ভে এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বারে।

১. পুণ্ড্রনগর ও মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি

বাংলার মাটিতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম খোদাইকৃত লিখিত ঐতিহাসিক দলিল হলো ঐতিহাসিক **মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি**। ১৯৩১ সালে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত এই ছোট চুনাপাথরের খণ্ডে ছয় লাইনে অশোকীয় ব্রাহ্মী লিপি ও প্রাকৃত ভাষায় এক অনন্য রাজকীয় নির্দেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে, যার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক (মৌর্য যুগ)।

এই শিলালিপিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষের সময় রাষ্ট্রীয় খাদ্যগুদাম থেকে খাদ্য ও অর্থ বিতরণের এক বিস্ময়কর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রমাণ মেলে:

> *“পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি নির্দেশ: কোনো জরুরি সংকট, অনাবৃষ্টি বা পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে রাষ্ট্রীয় শস্যাগার (কোঠাগাল) থেকে শস্য এবং রাজকোষ থেকে অর্থ (গণ্ডক ও কাকণিক মুদ্রা) অভাবগ্রস্ত জনগণকে (সংবঙ্গীয়দের) প্রদান করতে হবে। সংকট কেটে গেলে তারা পুনরায় সেই শস্য ও অর্থ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে ফেরত প্রদান করবে।”*
> — ***মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপি*** *(আনু. খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক)*

২২০০ বছর পূর্বের এই প্রশাসনিক নির্দেশনামা প্রমাণ করে যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে পুণ্ড্রনগর ছিল এক সুসংগঠিত নগরকেন্দ্র, যেখানে নাগরিকদের জানমাল সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

২. মৌর্য শাসন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮–২৩২ অব্দ) শাসনামলে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় সাম্রাজ্যের শাসন সুসংহত হয়। পরবর্তীকালে বাংলায় আগত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৫ম শতক) এবং হিউয়েন সাং (৭ম শতক) পুণ্ড্রবর্ধন ও তাম্রলিপ্তিতে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত একাধিক বৌদ্ধ স্তূপ প্রত্যক্ষ করার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলে এই নদীবিধৌত বাংলায় মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। নদীবাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে শত শত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার, যা শুধু ধর্মচর্চাই নয়—চিকিৎসা সেবা, পাণ্ডুলিপি লিখন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

৩. গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ (৪র্থ – ৬ষ্ঠ শতক)

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত **এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি**-তে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার *সমতট* রাজ্যকে একটি করদ সীমান্ত রাজ্য (প্রত্যন্ত-রাজ্য) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে উত্তর ও পশ্চিম বাংলা সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে **পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি** নামে একটি প্রদেশে রূপ নেয়।

দামোদরপুর ও পাহাড়পুর তাম্রশাসন

দিনাজপুরের দামোদরপুর ও নওগাঁর পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত গুপ্ত আমলের তাম্রশাসনগুলো তৎকালীন স্থানীয় সরকার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার এক অপূর্ব চিত্র তুলে ধরে:

- **প্রাদেশিক ও জেলা শাসন:** প্রদেশের প্রধান শাসক ছিলেন *উপরি-ক* (ভাইসরয়), যিনি সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রদেশগুলো বিভক্ত ছিল জেলায় (*বিষয়*, যেমন কোটিবর্ষ বিষয়), যার প্রধান ছিলেন *বিষয়পতি*।
- **পৌর পরিষদ ও নাগরিক প্রতিনিধিত্ব:** বিষয়পতি একা সিদ্ধান্ত নিতেন না; তাঁর সাথে জেলা প্রশাসনে চারজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতেন:
    - *নগর-শ্রেষ্ঠী:* প্রধান বণিক ও ব্যাংকারদের প্রতিনিধি।
    - *সার্থবাহ:* বাণিজ্যিক কাফেলা ও দূরপাল্লার ব্যবসায়ীদের প্রধান।
    - *প্রথম-কুলিক:* কারিগর ও শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধান।
    - *প্রথম-কায়স্থ:* প্রধান দলিল লেখক ও নথি সংরক্ষক।
- **ভূমি বিক্রয় ও পুস্তপাল ব্যবস্থা:** পতিত বা সরকারি বনভূমি বিক্রয়ের পূর্বে *পুস্তপাল* (রেকর্ড কিপার)-দের দ্বারা ভূমির মালিকানা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হতো। এর মাধ্যমে বাংলায় বৈদিক পণ্ডিত ও বৌদ্ধ মঠের জন্য কৃষিভূমি সম্প্রসারিত হয়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

৪. তাম্রলিপ্তি: বহির্বিশ্বে বাংলার প্রবেশদ্বার

অভ্যন্তরীণ বাংলায় যখন পুণ্ড্রনগর শাসনক্ষমতা পরিচালনা করত, তখন রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত বন্দরনগরী **তাম্রলিপ্তি** (বর্তমান তমলুক) ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর। গঙ্গা অববাহিকা থেকে বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত এই বন্দর থেকে সিংহল (শ্রীলঙ্কা), সুবর্ণভূমি (মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া) এবং চীনে নিয়মিত বাণিজ্যজাহাজ যাতায়াত করত।

চীনা পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ৪১০ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্তি বন্দরে পৌঁছান এবং এর সমৃদ্ধি দেখে অভিভূত হন:

> *“এখানে চব্বিশটি বৌদ্ধ মঠ রয়েছে, যেখানে অসংখ্য ভিক্ষু অবস্থান করেন এবং বুদ্ধের অনুশাসন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। ফা-হিয়েন এখানে দুই বছর অবস্থান করে বৌদ্ধ বিনয় পিটকের পাণ্ডুলিপি নকল করেন এবং বুদ্ধমূর্তির ছবি আঁকেন। অতঃপর তিনি একটি বিশাল বাণিজ্য জাহাজে আরোহণ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন এবং মাত্র চৌদ্দ দিনে সিংহল দ্বীপে উপনীত হন।”*
> — ***ফা-হিয়েন**, ফো-কুও-কি (বৌদ্ধ রাজ্যের বিবরণী)*

তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে বাংলার বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র (মসলিন), রেশম, পোড়ামাটির পাত্র ও উন্নতমানের ইস্পাত বিদেশে রপ্তানি হতো এবং বিনিময়ে আসত রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা, কাচ ও মসলা। ষষ্ঠ শতকের সূচনায় বাংলা ছিল এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রগণ্য সভ্যতার লীলাভূমি।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- ভাণ্ডারকর, ডি. আর. (১৯৩২)। *ইমপর্ট্যান্ট এপিগ্রাফিক্যাল ডিসকভারিজ: দ্য মহাস্থান ইনস্ক্রিপশন*। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৪৩)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ১ম খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- চক্রবর্তী, রণবীর (২০০২)। *ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি*। মনোহর।
- লেগ, জেমস (১৮৮৬)। *আ রেকর্ড অব বুদ্ধিস্টিক কিংডমস: ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্ত*। অক্সফোর্ড।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ধ্রুপদী সাম্রাজ্য ও নগরকেন্দ্র — মহাস্থানগড়, মৌর্য যুগ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ২।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-2-classical-empires-mahasthangarh-and-guptas-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

সার্বভৌমত্বের উন্মেষ — গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক এবং মাৎস্যায়মের অন্ধকার

সার্বভৌমত্বের উন্মেষ — গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক এবং মাৎস্যায়মের অন্ধকার

699 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৩: *চিত্র: গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্কের স্বর্ণদিনার (আনু. ৫৯০–৬২৫ খ্রিস্টাব্দ), যার সম্মুখভাগে নন্দী বৃষের ওপর উপবিষ্ট শিবের প্রতিকৃতি খোদাইকৃত—যা বাংলার প্রথম সার্বভৌম ঐক্যের প্রতীক।*

ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব ভারতে এক সুদূরপ্রসারী ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় প্রথমবারের মতো বাংলা উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা ছিন্ন করে এক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের স্থপতি ছিলেন **গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক**। কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে শশাঙ্ক একাধারে কনৌজ ও আসামের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেন এবং বাংলায় এক স্বাধীন রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নেমে আসে শতাব্দীর সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়—বিখ্যাত *মাৎস্যায়ম*-এর অরাজকতা।

১. সাম্রাজ্যের পতন ও স্বাধীন গৌড়ের উত্থান

ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হুণ আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এই সুযোগে বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়: দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে *বঙ্গ* (গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের অধীনে) এবং উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে **গৌড়**। এই গৌড় রাজ্যেই এক দূরদর্শী সামরিক নেতার আবির্ভাব ঘটে—**শশাঙ্ক** (শাসনকাল আনু. ৫৯০–৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রথম জীবনে পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের অধীনে একজন মহাসামন্ত থাকলেও শশাঙ্ক দ্রুত নিজের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং *মহারাজাধিরাহ* উপাধি ধারণ করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের নিকটবর্তী রাজবাড়ি ডাঙ্গায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বিখ্যাত রাজধানী **কর্ণসুবর্ণ**। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এই দুর্গনগরী ছিল এক বিশাল বাণিজ্য ও সামরিক কেন্দ্র।

২. শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার ঐতিহাসিক সংঘাত

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে শশাঙ্কের শাসনকাল এক শ্বাসরুদ্ধকর ভূরাজনৈতিক যুদ্ধের জন্য স্মরণীয়। কনৌজের মৌখরী রাজবংশ ও থানেস্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশের আধিপত্য রুখতে শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সাথে এক সামরিক মিত্রজোট গড়ে তোলেন।

কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর পুষ্যভূতি বংশের রাজা রাজ্যবর্ধন প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হলে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের সাথে তাঁর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং রাজ্যবর্ধন নিহত হন। এর পর রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি **হর্ষবর্ধন** সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শশাঙ্ককে দুই দিক থেকে অবরুদ্ধ করার জন্য কামরূপের (আসাম) রাজা **ভাস্করবর্মা**-র সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট তাঁর *হর্ষচরিত* কাব্যে শশাঙ্ককে তীব্র আক্রমণ করে খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু উত্তর ভারত ও আসামের দুই মহাশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ সত্ত্বেও শশাঙ্ক আজীবন তাঁর স্বাধীন গৌড় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। তিনি পশ্চিমে বারাণসী এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ (কঙ্গোদ) পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। শিবের পরম ভক্ত শশাঙ্ক নন্দী বৃষ ও শিবের প্রতিকৃতি সংবলিত খাঁটি স্বর্ণদিনার প্রচলন করেছিলেন, যা বাংলার স্বাধীন অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক।

৩. হিউয়েন সাংয়ের বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণ

শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পর আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং** গৌড় রাজ্যে ভ্রমণ করেন। বাণভট্টের পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনার বিপরীতে হিউয়েন সাং কর্ণসুবর্ণের এক সমৃদ্ধ ও বহুত্ববাদী চিত্র তুলে ধরেন:

> *“কর্ণসুবর্ণ রাজ্যটি পরিধিতে প্রায় দেড় হাজার লি; এর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী প্রায় বিশ লি বিস্তৃত। দেশটি অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। আবহাওয়া মনোরম, মানুষের আচরণ মার্জিত এবং তারা জ্ঞানচর্চায় অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ। রাজধানীতে প্রায় পঞ্চাশটি বৌদ্ধ বিহার রয়েছে যেখানে প্রায় দুই হাজার সম্যতীয় মতাবলম্বী ভিক্ষু বাস করেন। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পঞ্চাশটিরও বেশি দেবমন্দির রয়েছে।”*
> — ***হিউয়েন সাং**, সি-ইউ-কি (পশ্চিম গোলার্ধের বৌদ্ধ বিবরণী)*

হিউয়েন সাংয়ের এই নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ প্রমাণ করে যে শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না; বরং তাঁর রাজধানীতে বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার ও হিন্দু মন্দিরগুলো পাশাপাশি সমৃদ্ধির সাথে বিরাজ করত।

৪. মাৎস্যায়মের ভয়াবহ অরাজকতা (আনু. ৬৫০ – ৭৫০ খ্রি.)

আনুমানিক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। কোনো যোগ্য উত্তরসূরি না থাকায় কামরূপের ভাস্করবর্মা ও কনৌজের হর্ষবর্ধন গৌড় আক্রমণ করে বিভক্ত করে নেন (নিধানপুর তাম্রশাসন প্রমাণ করে ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ থেকেই জমিদান করেছিলেন)। এরপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, কনৌজরাজ যশোবর্মা এবং তিব্বতি লুটেরা বাহিনীর একের পর এক হামলায় সমগ্র বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় শাসনের সম্পূর্ণ তিরোধানে বাংলায় যে অরাজক অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, তাকে ইতিহাসে বলা হয় **মাৎস্যায়ম** (মাছের নিয়ম):

> *“যেখানে কোনো রাজা বা সুশাসন নেই, সেখানে দুর্বলের কোনো স্থান নেই; ঠিক যেমন জলাশয়ে বড় মাছগুলো কোনো দয়া-মায়া ছাড়া ছোট মাছগুলোকে গিলে খায়। মাৎস্যন্যায়ে কোনো আইন নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, নেই সম্পত্তির অধিকার; ক্ষমতাশালীরা দুর্বলের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।”*
> — ***কৌটিল্য**, অর্থশাস্ত্র (মাৎস্যন্যায়ের সংজ্ঞা)*

প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলা এই নৈরাজ্যে সামন্তরা নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সাধারণ কৃষক ও প্রজারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই চরম নৈরাশ্য থেকেই প্রাচীন এশিয়ার ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ম হয়—অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্তরা সম্মিলিতভাবে একজন সাধারণ নেতাকে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসান।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৪৩)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ১ম খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বিল, স্যামুয়েল (১৮৮৪)। *সি-ইউ-কি: বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস অব দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড*। লন্ডন।
- কাওয়েল ও থমাস (১৮৯৭)। *দ্য হর্ষচরিত অব বাণভট্ট*। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি।
- বসাক, রাধাগোবিন্দ (১৯১৯)। *ত্রিপুরা কপারপ্লেট গ্রান্ট অব লোকনাথ*। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সার্বভৌমত্বের উন্মেষ — গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক এবং মাৎস্যন্যায়ের অন্ধকার"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৩।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-3-king-sasanka-and-matsyanyayam-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ — গোপালের নির্বাচন, সোমপুর মহাবিহার এবং বাংলা ভাষার জন্ম

পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ — গোপালের নির্বাচন, সোমপুর মহাবিহার এবং বাংলা ভাষার জন্ম

737 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৪: *চিত্র: পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের বায়বীয় দৃশ্য (নওগাঁ), যা ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে পাল সম্রাট ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একদা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বৌদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্র ছিল।*

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মাৎস্যায়মের শতবর্ষব্যাপী নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে বাংলার সামন্ত ও সাধারণ জনগণ এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্যের স্বাক্ষর রাখে। তারা একমত হয়ে **গোপাল** নামক এক সুযোগ্য সামরিক নেতাকে সিংহাসনে বসায়। এই যুগান্তকারী নির্বাচনের মাধ্যমে সূচিত হয় গৌরবময় **পাল সাম্রাজ্য** (আনু. ৭৫০–১১৬১ খ্রি.)। প্রায় চারশত বছরব্যাপী এই বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বাংলাকে উত্তর ভারতের এক মহাশক্তিতে পরিণত করে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ জ্ঞানপীঠ সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করে, তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের ঐতিহাসিক ধর্মপ্রচার ঘটায় এবং *চর্যাপদ*-এর সাধকদের অমর চরণের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম দেয়।

১. গোপালের নির্বাচন ও খালিমপুর তাম্রশাসন

আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গোপালের সিংহাসন আরোহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর সুযোগ্য পুত্র সম্রাট ধর্মপালের ৩২তম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বিখ্যাত **খালিমপুর তাম্রশাসন**-এ। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঐতিহাসিক দলিল:

> *“মাৎস্যায়ং অপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরোমণিঃ…”*
> *(“মাৎস্যায়মের অরাজকতা দূর করার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ (জনগণ ও সামন্তরা) যাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়েছিল—সেই নরপতিগণের শিরোমণি গোপাল থেকে এক অনুপম গুণরাশির জন্ম হয়…”)*
> — ***খালিমপুর তাম্রশাসন*** *(আনু. ৭৮৫ খ্রি.)*

এই ঐতিহাসিক শ্লোকটি প্রমাণ করে যে গোপাল কোনো বহিরাগত বিজেতা ছিলেন না; মাৎস্যায়মের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ সম্মিলিতভাবে তাঁকে নির্বাচিত করেছিল। গোপাল দ্রুত বরেন্দ্র, গৌড় ও বঙ্গ অঞ্চলকে একত্রিত করে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

২. সাম্রাজ্যের স্বর্ণশিখরে: ধর্মপাল ও দেবপাল

গোপালের পুত্র **ধর্মপাল** (শাসনকাল আনু. ৭৭০–৮১০ খ্রি.) বাংলাকে একটি আঞ্চলিক রাজ্য থেকে সমগ্র উত্তর ভারতের প্রধান সাম্রাজ্যে রূপান্তর করেন। তিনি গঙ্গানদীর অববাহিকা ধরে অগ্রসর হয়ে কনৌজ অধিকার করেন এবং ইন্দ্রায়ুধকে অপসারিত করেন। কনৌজে আয়োজিত এক বিশাল দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তি ও গান্ধারের রাজারা ধর্মপালের অধীনতা স্বীকার করেন এবং ধর্মপাল *পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর* উপাধি গ্রহণ করেন।

এই বিস্তারের মধ্য দিয়ে বাংলা জড়িয়ে পড়ে রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের সাথে উত্তর ভারতের আধিপত্যের ঐতিহাসিক **ত্রিপক্ষীয় সংঘাত**-এ। ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র **দেবপাল** (শাসনকাল আনু. ৮১০–৮৫০ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যকে তার ভৌগোলিক সীমানার সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যান। তাঁর বাদাল স্তম্ভলিপি অনুযায়ী তাঁর অভিযান হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং আসামের কামরূপ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

৩. সোমপুর মহাবিহার ও বৌদ্ধ রেনেসাঁ

পাল রাজারা ছিলেন মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের বদান্যতায় বাংলায় এমন সব জ্ঞানপীঠ গড়ে ওঠে যা সমগ্র এশিয়ার পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করত:

- **সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর, নওগাঁ):** সম্রাট ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিহারটি প্রায় ২৭ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্রুশাকার সুবিশাল মন্দির এবং চারপাশের ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ বিশ্ব স্থাপত্যের এক পরম বিস্ময়। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ২,৮০০টিরও বেশি পোড়ামাটির ফলকে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন—নৃত্যশিল্পী, শিকারী, তীরন্দাজ ও পশুপাখির রূপ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এই স্থাপত্যরীতি পরবর্তীকালে মিয়ানমারের বাগান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রাম্বানান মন্দিরের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।
- **বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী:** নালন্দার পাশাপাশি ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহার ছিল বৌদ্ধ দর্শন ও তান্ত্রিক বিদ্যার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়।
- **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:** নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও জাভার শৈলেন্দ্র বংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং দেবপালের কাছে সেই মঠের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম অনুদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যা বাংলার বৈশ্বিক মর্যাদার প্রমাণ দেয়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮২–১০৫৪ খ্রি.)

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত **অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান**। নালন্দা ও ওদন্তপুরীতে শিক্ষালাভ এবং সুমাত্রায় বারো বছর অবস্থান শেষে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য নিযুক্ত হন। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে বৃদ্ধ বয়সে দুর্গম হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে পৌঁছান। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মকে সংস্কার করেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ *বোধিপথপ্রদীপ* তিব্বতি বৌদ্ধ দর্শনের মূল স্তম্ভে পরিণত হয়। সমগ্র তিব্বত ও হিমালয় অঞ্চলে আজও তিনি পরম শ্রদ্ধায় পূজিত হন।

৪. চর্যাপদ: বাংলা ভাষার প্রথম পদধ্বনি

পাল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলো **বাংলা ভাষার জন্ম**। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ—লুইপা, কাহ্নপা, ভুসুকুপা ও শবরপা—যে আধ্যাত্মিক গানগুলো রচনা করেছিলেন, তা-ই হলো **চর্যাপদ**।

১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদের তালপাতার পুথি আবিষ্কার করেন। এই ৪৬টি গানে ব্যবহৃত প্রাচীন বাংলা ভাষা সান্ধ্য ভাষা (আলো-আঁধারির ভাষা) নামে পরিচিত। এই গানগুলোতে তান্ত্রিক সাধনার রহস্য প্রকাশের জন্য নদীমাতৃক বাংলার বাস্তব জীবনের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে—খেয়া নৌকা, বাঁশের সাঁকো, তুলা ধোনা, মাছ ধরা এবং শবর ব্যাধের জীবন:

> *“কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥”*
> *(“শরীর যেন একটি সুন্দর বৃক্ষ, তার পাঁচটি ডাল [পঞ্চ ইন্দ্রিয়]। চঞ্চল চিত্তে কাল বা মৃত্যু প্রবেশ করে।”)*
> *— **লুইপা**, চর্যাপদ (১ম পদ)*

চর্যাপদের মধ্য দিয়েই বিশ্বসাহিত্যে বাংলা ভাষা প্রথম কথা বলে উঠেছিল। পাল সাম্রাজ্যের চারশত বছরের স্থিতিশীলতা, জ্ঞানচর্চা ও মানবিক উদারতাই জন্ম দিয়েছিল বাঙালির এই শাশ্বত সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৪৩)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ১ম খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- কিলহর্ন, এফ. (১৮৯৬)। *দ্য খালিমপুর প্লেট অব ধর্মপালদেব*। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৯১৬)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
- চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার (১৯২৬)। *দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (ODBL)*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ — গোপালের নির্বাচন, সোমপুর মহাবিহার এবং বাংলা ভাষার জন্ম"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৪।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-4-pala-empire-and-charyapada-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

সেন রাজবংশ — ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণ, কৌলীন্য প্রথা এবং রাজদরবারের সাহিত্য

সেন রাজবংশ — ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণ, কৌলীন্য প্রথা এবং রাজদরবারের সাহিত্য

584 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৫: *চিত্র: একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সেন রাজবংশের কালো কষ্টিপাথরের দেবমূর্তি, যা মধ্যযুগীয় বাংলার সূক্ষ্ম অলঙ্করণ শৈলী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজদরবারের শিল্পোৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়।*

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দীর্ঘ চারশত বছরের বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। এই শূন্যতায় দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রাজবংশ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে: **সেন রাজবংশ** (আনু. ১০৯৭–১২০৪ খ্রি.)। নিজেদের ‘ব্রহ্মক্ষত্রিয়’ বলে দাবি করা সেন রাজারা বাংলায় পুনরায় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটান। সমাজ সংস্কারের নামে কঠোর বর্ণভেদ ও *কৌলীন্য প্রথা* প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি তাঁরা নবদ্বীপের রাজদরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন—যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কবি জয়দেব ও তাঁর অমর সৃষ্টি গীতগোবিন্দ।

১. কর্ণাটক থেকে বাংলায় আগমন ও বিজয়সেনের উত্থান

একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের কল্যাণীর চালুক্য অথবা চোল রাজাদের সামরিক অভিযানের সূত্র ধরে সেন বংশের পূর্বপুরুষরা বাংলায় আগমন করেন। রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী এই পরিবারের আদিপুরুষ **সামন্তসেন** শেষ জীবনে গঙ্গার তীরে তপস্বী হিসেবে জীবনযাপন করেন। কিন্তু তাঁর পৌত্র **বিজয়সেন** (শাসনকাল আনু. ১০৯৭–১১৬০ খ্রি.) নিজ সামরিক প্রতিভাবলে সমগ্র বাংলায় সেন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে আবিষ্কৃত এবং সভাকবি উমাপতিধর রচিত বিখ্যাত **দেওপাড়া প্রশস্তি**-তে বিজয়সেনের দিগ্বিজয়ের মহাকাব্যিক বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে:

> *“যিনি বীর, নান্য, বর্ধন ও রাঘবকে পরাজিত করিয়াছিলেন; যিনি গৌড়রাজকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন… সেই মহারাজ বিজয়সেন মেরু পর্বতের শিখরের ন্যায় আকাশচুম্বী এক সুরম্য প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করিলেন।”*
> — ***দেওপাড়া শিলালিপি*** *(১২শ শতক)*

বিজয়সেন দুর্বল পাল রাজাদের বিতাড়িত করে বরেন্দ্র, গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গ অঞ্চলকে নিজের অধীনে এনে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং উত্তরবঙ্গে বিজয়পুর ও পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে দুটি রাজধানী স্থাপন করেন।

২. বল্লালসেন ও কৌলীন্য প্রথার কঠোর শাসন

বিজয়সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর মহাপণ্ডিত পুত্র **বল্লালসেন** (শাসনকাল আনু. ১১৬০–১১৭৯ খ্রি.)। বল্লালসেন নিজে ছিলেন একাধারে সুশাসক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি দুটি বিখ্যাত সংস্কৃত আকরগ্রন্থ রচনা করেন: *দানসাগর* (ধর্মীয় দান-ধ্যানের নিয়মাবলী) এবং *অদ্ভুতসাগর* (জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক লক্ষণের সংকলন, যা পরে তাঁর পুত্র শেষ করেন)।

বল্লালসেনের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত সংস্কার ছিল **কৌলীন্য প্রথা**-র প্রবর্তন। চার শতাব্দীর বৌদ্ধ সাম্যবাদী ভাবধারা মুছে ফেলে কঠোর বৈদিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়কে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন। নয়টি বিশেষ গুণের (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান) অধিকারী বংশগুলোকে ‘কুলীন’ মর্যাদা দেওয়া হয়।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এই কৌলীন্য প্রথা বাংলায় এক চরম সামাজিক অভিশাপে রূপ নেয়। কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য বহুবিবাহ, বৃদ্ধের সাথে শিশুকন্যার বিবাহ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর বর্ণবাদী অত্যাচারের এক অন্ধকার যুগ নেমে আসে।

৩. লক্ষ্মণসেনের রাজদরবার ও পঞ্চরত্ন সাহিত্যিক

বল্লালসেনের পুত্র **লক্ষ্মণসেন** (শাসনকাল আনু. ১১৭৯–১২০৪ খ্রি.) পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসেন। যুদ্ধজয়ের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সমগ্র ভারতে। নবদ্বীপের (নদীয়া) রাজদরবারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন *পঞ্চরত্ন* নামে পরিচিত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যিকের এক অনন্য পরিষদ:

- **কবি জয়দেব:** সংস্কৃত সাহিত্যের অমর গীতিকাব্য **গীতগোবিন্দ**-এর রচয়িতা। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে রচিত এই কাব্যের সুর ও ছন্দ বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল।
- **ধোয়ী:** লক্ষ্মণসেনের সভাকবি যিনি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচনা করেন বিখ্যাত দূতকাব্য *পবনদূত*।
- **উমাপতিধর, শরণ ও গোবর্ধন:** উচ্চমানের ধ্রুপদী সংস্কৃত কবি। গোবর্ধন রচনা করেছিলেন *আর্যাসপ্তশতী*।
- **শ্রীধরদাস:** লক্ষ্মণসেনের রাজকর্মচারী যিনি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন বিখ্যাত সংস্কৃত কবিতা সংকলন *সদুক্তিকর্ণামৃত*, যেখানে প্রাচীন ভারতের ৪৮৫ জন কবির ২,৩৭০টি শ্লোক সংরক্ষিত হয়েছে।

৪. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও পতনের পদধ্বনি

রাজদরবারে সাহিত্যের আলোকচ্ছটা থাকলেও সেন সাম্রাজ্যের সামাজিক ভিত্তি ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর। জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বর্ণব্যবস্থার কারণে সাধারণ কৃষক, তাঁতি, জেলে এবং পদদলিত বৌদ্ধরা রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উচ্চবর্ণের ক্ষুদ্র অভিজাতদের সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই আত্মিক দূরত্বের কারণেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহী যোদ্ধার আগমনেই সেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভ তাসের ঘরের মতো কেঁপে উঠেছিল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৪৩)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ১ম খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- কিলহর্ন, এফ. (১৮৯২)। *দ্য দেওপাড়া ইনস্ক্রিপশন অব বিজয়সেন*। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা।
- চক্রবর্তী, মনোমোহন (১৯০৬)। *সংস্কৃত লিটারেচার ইন বেঙ্গল ডিউরিং দ্য সেনা পিরিয়ড*। এশিয়াটিক সোসাইটি।
- রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৪৯)। *বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*। বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সেন রাজবংশ — ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণ, কৌলীন্য প্রথা এবং রাজদরবারের সাহিত্য"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৫।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-5-sena-dynasty-and-court-literature-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

তুর্কি বিজয় ও প্রারম্ভিক মুসলিম শাসন — বখতিয়ার খলজি, লখনৌতি এবং সুফি সাধকগণ

তুর্কি বিজয় ও প্রারম্ভিক মুসলিম শাসন — বখতিয়ার খলজি, লখনৌতি এবং সুফি সাধকগণ

627 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৬: *চিত্র: বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুফি সাধক ও প্রশাসক খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত হয়—তুঘলক স্থাপত্যরীতি প্রভাবিত বাংলার অনবদ্য ইসলামিক স্থাপত্য।*

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের ঘোর অঞ্চলের খলজ উপজাতির এক দুঃসাহসী সামরিক অধিনায়ক, **ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি**, ঝাড়খণ্ডের দুর্গম অরণ্যপথ অতিক্রম করে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া রাজপ্রাসাদে অতর্কিত প্রবেশ করেন। এই আকস্মিক আক্রমণ সেন বংশের শাসনকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাংলার ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী নতুন যুগের সূচনা করে: বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা, লখনৌতিকে (গৌড়) কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান এবং সুফি সাধকদের মানবিক দাওয়াতের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ সমাজে এক নিঃশব্দ আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

১. নদিয়ার সেই ঐতিহাসিক আক্রমণ (১২০৪ খ্রি.)

বখতিয়ার খলজির নদীয়া অভিযানের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় সমসাময়িক ফার্সি ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ জুযজানির বিখ্যাত গ্রন্থ **তাবাকাত-ই-নাসিরী**-তে। মিনহাজ বখতিয়ারের অভিযানের চার দশক পর লখনৌতি ভ্রমণ করে সেই অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সৈনিকদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন:

> *“মুহম্মদ বখতিয়ার এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে তাল মিলাইতে পারিয়াছিল; মূল সৈন্যবাহিনী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল। নদীয়া নগরীর তোরণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ অশ্ব ব্যবসায়ী মনে করা হয়। তিনি দ্বিপ্রহরে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, যখন রায় লক্ষ্মণসেন মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে শোরগোল উঠিল যে তুর্কিরা আসিয়া পড়িয়াছে; তখন রায় লক্ষ্মণসেন পিছনের দরজা দিয়া নদীয়ার নদীপথে পূর্ববঙ্গের (বিক্রমপুর) অভিমুখে পলায়ন করিলেন...”*
> — ***মিনহাজ-ই-সিরাজ জুযজানি**, তাবাকাত-ই-নাসিরী (১২৬০ খ্রি.)*

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একে মাত্র আঠারো জন দিয়ে বাংলা জয়ের কাহিনি হিসেবে চিত্রিত করলেও আধুনিক ইতিহাসবিদরা দেখিয়েছেন যে এটি ছিল মূল রাজপ্রাসাদে একটি সুপরিকল্পিত গেরিলা কমান্ডো হামলা। রাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গের সুরম্য দুর্গনগরী **বিক্রমপুর**-এ অবস্থান নেন। সেখানে লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন আরও কয়েক দশক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

২. লখনৌতি ও ‘বলঘাকপুর’-এর বিদ্রোহের ইতিহাস

বখতিয়ার খলজি উত্তর ও পশ্চিম বাংলার শাসনভার সুসংহত করে প্রাচীন লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষে গড়ে তোলেন নতুন রাজধানী **লখনৌতি** (পরবর্তীকালে যা গৌড় নামে পরিচিত হয়)। তিনি সেখানে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন।

পরবর্তী প্রায় দেড়শত বছর বাংলা ছিল দিল্লির সুলতানদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও অশান্ত প্রদেশ। গিয়াসউদ্দিন বলবন থেকে শুরু করে আলাউদ্দিন খলজি এবং মুহম্মদ বিন তুঘলক পর্যন্ত দিল্লির পরাক্রমশালী শাসকরা বারবার বাংলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন। বাংলার সুবিশাল নদীনালা এবং বছরের ছয় মাস বর্ষার প্লাবন দিল্লির অশ্বারোহী বাহিনীর চলাচলে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করত। ফলে এখানকার সুবাদাররা প্রায়শই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের নামে মুদ্রা চালু করতেন। এই কারণে সমসাময়িক দিল্লির ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি লখনৌতির নাম দিয়েছিলেন **বলঘাকপুর**—যার অর্থ *“বিদ্রোহের শহর”*।

৩. সুফি সাধকদের আধ্যাত্মিক বিপ্লব

লখনৌতির দুর্গগুলো যখন সামরিক শাসন পরিচালনা করছিল, তখন বাংলার বিস্তীর্ণ প্রত্যন্ত জনপদে ইসলাম ও মানবতার প্রচার ঘটিয়েছিলেন সুদূর মধ্য এশিয়া, পারস্য ও আরব থেকে আগত **সুফি ও দরবেশগণ**। তাঁদের অহিংস জীবনধারা, মানবপ্রেম এবং বর্ণভেদহীন সাম্যের বার্তা তৎকালীন জাতপাতের যাতাকলে পিষ্ট বাংলার অবহেলিত সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে:

- **হজরত শাহ জালাল (র.) (১৩০৩ খ্রি.):** ইয়েমেন থেকে ৩৬০ জন আউলিয়া সঙ্গী নিয়ে তিনি শ্রীহট্টে (সিলেট) আগমন করেন এবং অত্যাচারী রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেন। তাঁর দরগাহ ও খানকা উত্তর-পূর্ব বাংলার শিক্ষা, সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার প্রধান কেন্দ্রে রূপ নেয়।
- **খান জাহান আলী (র.) ও বাগেরহাটের খলিফাতাবাদ:** পঞ্চদশ শতকে সুফি যোদ্ধা ও প্রশাসক হযরত খান জাহান আলী সুন্দরবনের গহীন বনভূমি পরিষ্কার করে গড়ে তোলেন খলিফাতাবাদ নগর রাষ্ট্র। তিনি লবণাক্ত ও রোগপীড়িত উপকূলীয় জনগণের জন্য শত শত মিষ্টি পানির বিশালাকার দিঘি খনন করেন এবং বিশ্বখ্যাত ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ **ষাট গম্বুজ মসজিদ** সহ তিন শতাধিক নান্দনিক মসজিদ নির্মাণ করেন।
- **বাবা আদম শহীদ (বিক্রমপুর) ও মখদুম শাহ দৌলা (শাহজাদপুর, পাবনা):** যাঁরা ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার তীরে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপন ও সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে নেতৃত্ব দেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই সুফি দরবেশরা কেবল ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন **অরণ্যজয়ী কৃষি-উদ্যোক্তা**। তাঁরা নদী অববাহিকায় বন কেটে নতুন কৃষিভূমি সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে গড়ে তুলেছিলেন মসজিদভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বাংলার নদী ও মাটির সাথে ইসলামী জীবনবোধের এক শাশ্বত মেলবন্ধন রচিত হয়।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- মিনহাজ-ই-সিরাজ জুযজানি (১২৬০)। *তাবাকাত-ই-নাসিরী* (অনুবাদ: আবদুল করিম)। বাংলা একাডেমি।
- ইটন, রিচার্ড এম. (১৯৯৩)। *দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- করিম, আবদুল (১৯৫৯)। *সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিমস ইন বেঙ্গল*। এশিয়াটিক সোসাইটি।
- বারানি, জিয়াউদ্দিন। *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী*। বিবলিওথেকা ইন্ডিকা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "তুর্কি বিজয় ও প্রারম্ভিক মুসলিম শাসন — বখতিয়ার খলজি, লখনৌতি এবং সুফি সাধকগণ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৬।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-6-turkish-conquest-and-sufis-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

স্বাধীন বাংলা সালতানাত — ইলিয়াস শাহী বংশ, আদিনা মসজিদ এবং "বাঙ্গালাহ্"র ঐতিহাসিক জন্ম

স্বাধীন বাংলা সালতানাত — ইলিয়াস শাহী বংশ, আদিনা মসজিদ এবং "বাঙ্গালাহ্"র ঐতিহাসিক জন্ম

765 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৭: *চিত্র: পান্ডুয়ায় সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আদিনা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ও সুবিশাল পাথরের খিলান—বাংলার স্বাধীন সালতানাতের সর্ববৃহৎ স্থাপত্য।*

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে দূরদর্শী ও যুগান্তকারী অধিনায়ক, **হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ**, লখনৌতির সিংহাসন দখল করে সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলো জয় করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করেন যা ইতিপূর্বে কোনো শাসক করতে পারেননি: সমগ্র ভাষাভিত্তিক, নদীমাতৃক বঙ্গীয় অববাহিকাকে এক অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন। নিজেকে *শাহ-ই-বাঙ্গালাহ* (“বাংলার রাজা”) এবং *সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ* উপাধিতে ভূষিত করে তিনি সূচনা করেন **স্বাধীন বাংলা সালতানাত**—দুই শতাব্দীর এক গৌরবময় যুগ, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যে মিং চীনকে যুক্ত করেছিল এবং বাংলার অনন্য স্থাপত্যরীতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

১. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও “বাঙ্গালাহ্”র ঐতিহাসিক জন্ম

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে “বঙ্গ” বা “বাঙ্গালাহ” বলতে মূলত পূর্ববঙ্গের প্লাবনভূমিকে বোঝাত; উত্তরবঙ্গ পরিচিত ছিল গৌড় বা বরেন্দ্র নামে এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত ছিল রাঢ় বা সাতগাঁও নামে। ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁওকে এক পতাকাতলে এনে প্রথমবারের মতো এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় সৃষ্টি করেন এবং নিজেকে সমগ্র অঞ্চলের অধিপতি হিসেবে *শাহ-ই-*

Shakil Mahmud • Research Monograph

বাঙ্গালাহ ঘোষণা করেন।

বাংলার এই স্বাধীনতা দিল্লির সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলককে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ১৩৫৩ সালে তিনি এক লক্ষ সৈন্য ও বহু যুদ্ধহস্তী নিয়ে বাংলা পুনরুদ্ধারে আক্রমণ চালান। কিন্তু ইলিয়াস শাহ খোলা ময়দানে যুদ্ধ না করে দিনাজপুর অঞ্চলে নদী ও কাঁদায় ঘেরা দুর্ভেদ্য **একডালা দুর্গ**-এ অবস্থান নেন:

> *"দিল্লির সুলতান পূর্ণ শক্তি দিয়া একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু দুর্গটি ছিল গভীর জল ও কর্দমাক্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। বাঙালি ধনুর্ধররা প্রাচীরের উপর হইতে ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করিয়া দিল্লির সৈন্যবাহিনীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করিল। যখন বর্ষা ঘনাইয়া আসিল এবং সৈন্যশিবিরে মহামারী দেখা দিল, তখন ফিরুজ শাহ তুঘলক বাধ্য হইয়া অবরোধ প্রত্যাহার করিলেন এবং ইলিয়াস শাহের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিয়া বাংলার স্বাধীনতা মানিয়া লইলেন।"*
> — ***জিয়াউদ্দিন বারানি**, তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী*

দিল্লির বিরুদ্ধে একডালা দুর্গের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা পরবর্তী দুই শতাব্দীর জন্য দিল্লির দাসত্বমুক্ত হয়ে এক পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন সালতানাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

২. সিকান্দার শাহ ও সুবিশাল আদিনা মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.)

ইলিয়াস শাহের পুত্র **সুলতান সিকান্দার শাহ** (শাসনকাল ১৩৫৮–১৩৯০ খ্রি.) মালদার নিকটবর্তী **পান্ডুয়া**-তে (ফিরোজাবাদ) নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩৫৯ সালে ফিরুজ শাহ তুঘলক দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করলে সিকান্দার শাহ পুনরায় একডালা দুর্গে দিল্লির বাহিনীকে রুখে দেন এবং দিল্লিকে স্থায়ী শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য করেন।

দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার এই মহান বিজয়ের স্মারক হিসেবে সিকান্দার শাহ ১৩৬৯ থেকে ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পান্ডুয়ায় নির্মাণ করেন ঐতিহাসিক **আদিনা মসজিদ**। ৫১৬ ফুট দীর্ঘ ও ৩০০ ফুট প্রশস্ত এই মসজিদটি ছিল:

- **দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ:** যা তৎকালীন দিল্লির কুতুব মিনারের পার্শ্ববর্তী কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের চেয়েও আয়তনে অনেক বড় ছিল।
- **স্থাপত্যের পরম বিস্ময়:** ৬০ ফুটেরও বেশি উঁচু বিশালাকার ব্যারেল-ভল্টেড মেহরাব, প্রাচীন স্থাপত্য থেকে সংগৃহীত ২৬০টি পাথরের স্তম্ভ এবং ৩৭০টি পোড়ামাটির গম্বুজ সম্বলিত।
- **বাদশাহ-কা-তখত:** মসজিদের ভেতরে তৈরি করা হয়েছিল পাথরের রাজকীয় বারান্দা, যেখানে সুলতান ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের পাহারায় জামাতে নামাজ আদায় করতেন।

৩. রাজা গণেশ ও সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে সালতানাতের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হয়। দিনাজপুরের ভাতুড়িয়ার শক্তিশালী হিন্দু জমিদার **রাজা গণেশ** দরবারের বিশৃঙ্খলার সুযোগে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। পরবর্তীতে প্রখ্যাত সুফি সাধক নূর কুতুবুল আলমের মধ্যস্থতায় গৃহযুদ্ধ এড়াতে রাজা গণেশ তাঁর বারো বছরের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসাতে সম্মত হন।

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (শাসনকাল ১৪১৫–১৪৩২ খ্রি.) নাম ধারণ করে এই বাঙালি নরপতি এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নেতৃত্ব দেন। তিনি আরবি লিপির পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় খোদাইকৃত সিংহের প্রতিকৃতিযুক্ত মুদ্রা চালু করেন, রাজদরবারে বৃহস্পতি রায়মুকুটের মতো বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবিদের উচ্চপদে নিয়োগ দেন এবং বহু হিন্দু অমাত্যকে সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন। এর ফলে সালতানাত তার তুর্কি-পারসিক খোলস ভেঙে এক খাঁটি বাঙালি সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

৪. মিং চীনের কূটনীতি ও সমুদ্র সিল্ক রোড

পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্বাধীন বাংলা সালতানাত সমকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি **চীনের মিং সাম্রাজ্য**-এর সাথে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সালের মধ্যে চীনা সম্রাট ইয়ংলের বিখ্যাত নৌসেনাপতি **অ্যাডমিরাল ঝেং হে** (Zheng He)-র সুবিশাল বহর একাধিকবার বাংলার চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছিল।

চীনা রাজকীয় দূত ও ইতিহাসবিদ **মা-হুয়ান** (Mahuan) ১৪৩৩ সালে তাঁর ভ্রমণগ্রন্থ *ইংইয়া শিংলান*-এ বাংলার অতুলনীয় ঐশ্বর্যের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন:

> *“বাঙ্গালাহ রাজ্যটি অত্যন্ত বিশাল এবং জনবহুল। এখানকার জনগণ বিত্তশালী, সুশীল এবং সূক্ষ্ম পোশাকে সজ্জিত। তাহারা বহু রকমের অনন্য সুতিবস্ত্র তৈরি করে, যাহার এক একটি পতঙ্গের ডানার ন্যায় স্বচ্ছ ও হালকা। লেনদেনে ব্যবহৃত হয় রূপার মুদ্রা, যাহাকে বলে ‘টাকা’ (Tanka)। রাজধানীতে সুলতানের রাজপ্রাসাদ অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সুদৃশ্য। সুলতান চীন সম্রাটের দরবারে মূল্যবান মুক্তা, মসলিন এবং একটি জীবন্ত জিরাফ উপহার পাঠাইয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া স্বয়ং সম্রাট মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।”*
>
> — ***মা-হুয়ান**, ইংইয়া শিংলান (সমুদ্রের প্রান্তের জরিপ)*

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সালতানাত বিশ্বমঞ্চে এক ধনকুবের বাণিজ্যিক পরাশক্তি হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল, যার সামুদ্রিক বাণিজ্য পারস্য উপসাগর থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- দানি, আহমদ হাসান (১৯৬১)। *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল*। এশিয়াটিক সোসাইটি।
- ইটন, রিচার্ড এম. (১৯৯৩)। *দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*। ক্যালিফোর্নিয়া।
- মাজিদ, খান আবদুল (১৯৬৫)। *দ্য ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল: ১৭৫৬–১৭৭৫*। কেমব্রিজ।
- সরকার, যদুনাথ (১৯৪৮)। *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ২য় খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "স্বাধীন বাংলা সালতানাত — ইলিয়াস শাহী বংশ, আদিনা মসজিদ এবং "বাঙ্গালাহ্"র ঐতিহাসিক জন্ম"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৭। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-7-independent-sultanate-and-ilyas-shahi-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

সালতানাতের স্বর্ণশিখর — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়

সালতানাতের স্বর্ণশিখর — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়

720 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৮: *চিত্র: সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলে (১৪৯৪–১৫১৯ খ্রি.) নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের পোড়ামাটির কারুকাজ ও অলঙ্কৃত পাথরের সম্মুখভাগ।*

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ তার সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়। এই স্বর্ণযুগের মহান রূপকার ছিলেন হোসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ** (শাসনকাল ১৪৯৪–১৫১৯ খ্রি.)। সমসাময়িক কবি ও ঐতিহাসিকদের কাছে *নৃপতি-তিলক* এবং *জগৎ-ভূষণ* অভিধায় অভিষিক্ত এই সুলতান বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাঁর দরবারেই প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত হয়, নবদ্বীপে সূচনা ঘটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বৈষ্ণব মহাজাগরণ এবং বাংলার মাটিতে রচিত হয় ছোট সোনা মসজিদ ও বাঘা মসজিদের মতো অমর স্থাপত্যকলা।

১. আলাউদ্দিন হোসেন শাহের উত্থান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হাবশি (আবিসিনীয়) ক্রীতদাস ও প্রাসাদরক্ষীদের একের পর এক ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডে লখনৌতির সালতানাত চরম সংকটে পড়েছিল। ১৪৯৪ সালে সুলতানের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী **সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন** অভিজাত হিন্দু-মুসলিম নাগরিক ও সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনে হাবশি শাসক মোজাফফর শাহকে উৎখাত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে বসেই হোসেন শাহ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকে ভেঙে দেন, রাজধানী গৌড়ে কঠোর শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং আসামের কামতা রাজ্য ও উড়িষ্যার গজপতি রাজাদের আগ্রাসন প্রতিহত করে বাংলার সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর দরবারে কোনো সম্প্রদায় বা জাতপাতের ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

২. বাংলা সাহিত্যের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা

হোসেন শাহী আমলের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক অবদান ছিল **মাতৃভাষা বাংলাকে রাজকীয় সাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা**। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সংস্কৃতে বিশ্বাসী ছিল এবং বাংলায় রামায়ণ-মহাভারত চর্চাকে পাপ মনে করত (এমনকি সংস্কৃত প্রবাদ ছিল: *“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ / ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ”*—অর্থাৎ যে বাংলায় পুরাণ শুনবে সে রৌরব নরকে যাবে)। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তাঁর সেনাপতিরা এই সামাজিক কুসংস্কার চূর্ণ করে বাংলা অনুবাদের দরজা উন্মুক্ত করে দেন:

- **মহাভারতের বাংলা অনুবাদ:** চট্টগ্রামের সুবাদার লস্কর পরাগল খানের নির্দেশে মহাকবি **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** রচনা করেন মহাভারতের প্রথম বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—*পাণ্ডববিজয়*। পরবর্তীতে পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি **শ্রীকর নন্দী** রচনা করেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ।
- **শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গুণরাজ খান:** প্রখ্যাত বাঙালি কবি **মালাধর বসু**কে সুলতান ভূষিত করেছিলেন *গুণরাজ খান* এবং তাঁর পুত্রকে *সত্যরাজ খান* রাজকীয় উপাধিতে।
- **বিজয় গুপ্ত ও মনসামঙ্গল:** সুলতানের সুবিচারের প্রশংসা করে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যে লিখেছেন:

> *“সুলতান হোসেন শাহা নৃপতি-তিলক / তঁহার পালনে প্রজা সুখে থাকে লোক / যেমন অর্জুন রাজা তেমনি সুন্দর / সকল গুণের নিধি ধর্মাবতার...”*
> — ***বিজয় গুপ্ত**, মনসামঙ্গল (আনু. ১৪৯৫ খ্রি.)*

৩. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিপ্লব

সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে নদীয়ার নবদ্বীপে আবির্ভূত হন বিশ্বখ্যাত আধ্যাত্মিক যুগপুরুষ **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু** (১৪৮৬–১৫৩৪ খ্রি.)। সংকীর্তনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজনীন প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি প্রাচীন জাতপাতভিত্তিক বর্ণবাদের শিকড় কাঁপিয়ে দেন।

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের বিরুদ্ধে তৎকালীন মুসলিম প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানালে সুলতান হোসেন শাহ এক ঐতিহাসিক রাজকীয় ফরমান জারি করেন: *“চৈতন্যদেবকে তাঁহার ধর্মপ্রচারে কোনো বাধা দেওয়া যাইবে না; তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা হরিনাম প্রচার করিতে পারিবেন।”* সুলতানের মন্ত্রিসভার দুই প্রভাবশালী শীর্ষ কর্মকর্তা—দবীর খাস (অর্থমন্ত্রী) ও সাকর মল্লিক (প্রধান সচিব)—সুলতানের চাকরি ত্যাগ করে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব দর্শনে অমর হয়ে ওঠেন **রূপ গোস্বামী** ও **সনাতন গোস্বামী** নামে।

৪. স্থাপত্যের অনন্য রত্ন: ছোট সোনা ও বাঘা মসজিদ

হোসেন শাহী আমলের শান্তি ও ধনসম্পদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর বহন করে তৎকালীন অনন্য পোড়ামাটি ও পাথরের ইসলামিক স্থাপত্য:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- **ছোট সোনা মসজিদ (গৌড়):** ওয়ালী মোহাম্মদ নামক এক রাজকর্মকর্তা কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটি ছিল হোসেন শাহী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কালো ব্যাসল্ট পাথর ও সূক্ষ্ম লতাপাতার খোদাইকাজে সুসজ্জিত এই মসজিদের পনেরোটি গম্বুজে স্বর্ণের পাত মোড়ানো ছিল, যা সূর্যের আলোয় সোনার মতো ঝলমল করত বলেই এর নাম হয়েছিল ‘ছোট সোনা মসজিদ’।
- **বাঘা মসজিদ (রাজশাহী):** ১৫২৩ সালে হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নুসরাত শাহ কর্তৃক নির্মিত। এর বাইরের দেয়ালে খোদাই করা অনন্য পোড়ামাটির ফলকে ডালিম গাছ, পদ্মফুল ও ময়ূরের দৃশ্য বাংলার নিজস্ব লোকশিল্পের জয়গান ঘোষণা করে।

৫. পর্তুগিজদের পদার্পণ: ইউরোপীয় বাণিজ্যের সূত্রপাত

হোসেন শাহের শাসনের শেষভাগে বাংলার বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মতো আগমন ঘটে ইউরোপীয় পর্তুগিজ নাবিকদের। ১৫১৮ সালে জোয়াও দে সিলভেইরার নেতৃত্বে একদল পর্তুগিজ চট্টগ্রামে পদার্পণ করে। বাংলার রেশম, সুতিবস্ত্র ও মসলার বিশাল বাণিজ্য প্রত্যক্ষ করে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে নাম দেয় **পোর্তো গ্রান্দে** (Porto Grande / বৃহৎ বন্দর) এবং হুগলির সাতগাঁও বন্দরকে নাম দেয় **পোর্তো পেকেনো** (Porto Pequeno / ক্ষুদ্র বন্দর)। এর মধ্য দিয়ে বাংলার মাটিতে সূচিত হয় ইউরোপীয় বণিকদের প্রথম পদচিহ্ন—যা দুই শতাব্দী পরে এক নতুন বৈশ্বিক সাম্রাজ্যিক সংঘাতের পটভূমি তৈরি করেছিল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- তরফদার, মমতাজুর রহমান (১৯৬৫)। *হোসেন শাহী বেঙ্গল (১৪৯৪–১৫৩৮)*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান।
- ইটন, রিচার্ড এম. (১৯৯৩)। *দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*। ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।
- সেন, দীনেশচন্দ্র (১৯১১)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ক্যাম্পোস, জে. জে. এ. (১৯১৯)। *হিস্ট্রি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল*। বাটারওয়ার্থ, কলকাতা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সালতানাতের স্বর্ণশিখর — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৮।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-8-alauddin-husain-shah-and-cultural-synthesis-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

বারো ভূঁইয়া ও মুঘল বিজয় — ঈসা খাঁ, নদীমাতৃক যুদ্ধ এবং ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার পত্তন

বারো ভূঁইয়া ও মুঘল বিজয় — ঈসা খাঁ, নদীমাতৃক যুদ্ধ এবং ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার পত্তন

661 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৯: *চিত্র: সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগরীর স্থাপত্য— বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁর প্রাচীন রাজধানী এবং মধ্যযুগীয় বাংলার বিখ্যাত মসলিন ও বস্ত্র বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল।*

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শের শাহ সুরির সাম্রাজ্য এবং মুঘল সম্রাট আকবরের উত্থানের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বে স্বাধীন বাংলা সালতানাত চূড়ান্ত সংকটের মুখোমুখি হয়। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানীর পতনের পর মুঘলরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করে। কিন্তু কাগজ-কলমে বাংলা জয় হলেও প্রায় চার দশক ধরে মুঘলদের অগ্রযাত্রাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে রেখেছিল বাংলার এক অপরাজেয় দেশপ্রেমিক শক্তি: **বারো ভূঁইয়া**। সোনারগাঁয়ের শাসক **ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা**-র নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ নদীমাতৃক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আকবরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের বারবার পরাজিত করেছিল—যতক্ষণ না সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতী ১৬১০ সালে **ঢাকা**-কে রাজধানী বানিয়ে এই প্রদেশকে বশীভূত করেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১. সুর সাম্রাজ্যের উত্থান ও কররানী সালতানাতের পতন

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে দূরদর্শী আফগান সেনাপতি **শের শাহ সুরি** সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলাকে সুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাংলার অতুলনীয় কৃষি ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে শের শাহ যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেন। তিনি মেঘনা নদীর তীরের প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু নদের তীরের পেশোয়ার/অ্যাটক পর্যন্ত বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ মহাসড়ক **সড়ক-ই-আজম** (গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড) সম্প্রসারিত করেন এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাকচৌকি স্থাপন করেন।

সুর বংশের পতনের পর কররানী আফগান রাজবংশ বাংলায় শাসন কায়েম রাখে। কিন্তু শেষ শাসক **দাউদ খান কররানী** সম্রাট আকবরের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে নিজের নামে মুদ্রা চালু করলে ১৫৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজমহলের প্রান্তরে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দাউদ খান পরাজিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ১৯তম সুবাহ হিসেবে ঘোষিত হলেও মূল প্লাবনভূমি মুঘলদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই থেকে যায়।

২. ঈসা খাঁ ও বারো ভূঁইয়াদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ

বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চল ‘ভাটি’ ছিল ঘোড়সওয়ার মুঘল বাহিনীর জন্য এক ভয়াল মৃত্যুফাঁদ। এই ভূপ্রাকৃতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বারো জন স্বাধীনচেতা স্থানীয় নৃপতি বা **বারো ভূঁইয়া** মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই প্রতিরোধের প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চলের অধিপতি **ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা**।

সম্রাট আকবরের রাজদরবারের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **আবুল ফজল** তাঁর অমর গ্রন্থ *আকবরনামা*-য় ঈসা খাঁর অপরাজেয় নৌবাহিনীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন:

> *“ভাটির মহাপরাক্রমশালী জমিদার ঈসা খাঁ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত সামন্তকে বশীভূত করিয়াছিলেন... তাঁহার অধীনে ছিল অসংখ্য রণতরী সংবলিত এক সুবিশাল নৌবাহিনী (নওয়ারা)। ইহার সাহায্যে তিনি রাজকীয় মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শুষ্ক সমতলে অশ্বারোহী যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত মুঘল সেনারা ভাটির অজস্র নদী, নালা ও প্লাবিত জলমগ্ন প্রান্তরে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না।”*
> — ***আবুল ফজল**, আকবরনামা (১৫৯৮ খ্রি.)*

আকবর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপুত সেনাপতি **রাজা মানসিংহ**-কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠালে ঈসা খাঁ নদীমাতৃক গেরিলা যুদ্ধে মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। ১৫৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিক্রমপুরের নিকটবর্তী মেঘনা নদীর ত্রিমোহনায় এক মহাকাব্যিক নৌযুদ্ধে ঈসা খাঁ ও মাসুম খান কাবুলি মুঘল নৌবহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের প্রিয় পুত্র দুর্জন সিংহ নিহত হন এবং মুঘলরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কথিত আছে, মল্লযুদ্ধে মানসিংহের তরবারি ভেঙে গেলে ঈসা খাঁ তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা না করে নিজের তরবারি এগিয়ে দিয়েছিলেন—যে মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে মানসিংহ ঈসা খাঁর জীবিতাবস্থায় আর পূর্ববঙ্গে হামলা চালাননি।

৩. সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতী ও রাজধানী ঢাকার পত্তন (১৬১০ খ্রি.)

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সুবাহ বাংলাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁর বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ সেনাপতি **ইসলাম খাঁ চিশতী**-কে ১৬০৮ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইসলাম খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন যে ঘোড়া দিয়ে বাংলায় জয় সম্ভব নয়; বাংলার জলযুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজন সুবিশাল **মুঘল নৌবাহিনী (নওয়ারা)**।

ভারী কামানবাহী ঘুরাব ও দ্রুতগামী কোষা নৌকা নিয়ে গঠিত বিশাল নৌবহর প্রস্তুত করে ইসলাম খাঁ একে একে বারো ভূঁইয়াদের দুর্গ আক্রমণ করেন। তিনি ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ, যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাজিত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন।

এই নদীমাতৃক সামরিক অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করতে এবং বঙ্গোপসাগরের পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইসলাম খাঁ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরে স্থানান্তর করেন—যার নাম **ঢাকা**। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্মানার্থে এর নতুন নামকরণ করা হয় **জাহাঙ্গীরনগর**। ১৬১০ সালের এই ঐতিহাসিক ক্ষণ থেকেই আধুনিক বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রাজধানী ঢাকার গৌরবময় চারশত বছরের ইতিহাসের সূচনা ঘটে।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- আবুল ফজল (১৫৯৮)। *আকবরনামা* (অনুবাদ: এইচ. বিভারিজ)। এশিয়াটিক সোসাইটি।
- মির্জা নাথান (১৬৩০)। *বাহারিস্তান-ই-গায়বি* (অনুবাদ: এম. আই. বোরাহ)। আসাম সরকার।
- করিম, আবদুল (১৯৯২)। *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: মুঘল পিরিয়ড (১ম খণ্ড)*। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- সরকার, যদুনাথ (১৯৪৮)। *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ২য় খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বারো ভূঁইয়া ও মুঘল বিজয় — ঈসা খাঁ, নদীমাতৃক যুদ্ধ এবং ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার পত্তন"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ৯। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-9-baro-bhuiyans-and-mughal-conquest-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

সুবাহ বাংলা — বিশ্ববাণিজ্যের পরাশক্তি এবং "জান্নাতুল বিলাদ" বা ভূস্বর্গ

সুবাহ বাংলা — বিশ্ববাণিজ্যের পরাশক্তি এবং "জান্নাতুল বিলাদ" বা ভূস্বর্গ

803 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১০: *চিত্র: ঢাকার লালবাগ দুর্গের (কেল্লা আওরঙ্গবাদ) দরবার হল (দেওয়ান-ই-আম) ও পরি বিবির মাজার—মুঘল সুবাহদার শায়েস্তা খাঁ ও যুবরাজ মুহাম্মদ আজম শাহের সময়কালের অমর কীর্তি।*

সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে বাংলা পরিণত হয়েছিল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান রত্নে। রাজকীয় ফার্সি সনদে **জান্নাতুল বিলাদ** ("দেশসমূহের স্বর্গ") হিসেবে অভিহিত **সুবাহ বাংলা** ছিল সমকালীন অ-পশ্চিমা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ও শিল্পোন্নত প্রদেশ। সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেকের জোগানদাতা এবং বৈশ্বিক শিল্পোৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশের উৎপাদক হিসেবে বাংলা পরিণত হয়েছিল বিশ্বের সর্বপ্রধান বস্ত্রশিল্পের কর্মশালায়। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সুবাদার মীর জুমলা ও শায়েস্তা খাঁর শাসনামলে বাংলা উপভোগ করেছিল অতুলনীয় নাগরিক প্রাচুর্য, সমুদ্র উপকূলের জলদস্যুমুক্ত শান্তি এবং এমন এক বিশ্ববাণিজ্য যা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের বণিকদের এই বদ্বীপে টেনে এনেছিল।

১. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি

মুঘল শান্তির (প্যাক্স মুঘলিকা) সুবাদে বাংলার কৃষি ও কুটির শিল্পে এক অবিশ্বাস্য বিপ্লব সাধিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলায় আগত ফরাসি পর্যটক ও চিকিৎসক **ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার** ১৬৬৮ সালে তাঁর ভ্রমণগ্রন্থে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন:

> *“বাংলা রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য শত দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু প্রস্থান করিবার একটি পথও নাই। পৃথিবীর কোথাও আমি এত অফুরন্ত চাল, চিনি, তরিতরকারি, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর প্রাচুর্য দেখি নাই। ইউরোপীয়রা আমেরিকার খনি হইতে যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য আনয়ন করে, বাংলার সিল্ক, মসলিন ও বস্ত্র ক্রয়ের জন্য তাহা এই ভূমিতে চিরতরে আটকা পড়িয়া যায়—যাহা এই দেশকে ধারণাতীতভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।”*
> — ***ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার***, *ট্রাভেলস ইন দ্য মোঘল এম্পায়ার (১৬৬৮ খ্রি.)*

তৎকালীন বিশ্বে বাংলা ছিল মূল্যবান রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার এক সুবিশাল রিজার্ভার। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ডাচ ভিওসি (VOC), ফরাসি কোম্পানি এবং আর্মেনীয় বণিকরা জাহাজ বোঝাই রূপার বার এনে বাংলার পণ্য ক্রয় করত:

- **ঢাকার বিশ্বখ্যাত মসলিন:** মেঘনা নদীর তীরে উৎপন্ন বিরল প্রজাতির *ফুটি কার্পাস* তুলা থেকে ঢাকার তাঁতিরা তৈরি করতেন কিংবদন্তিতুল্য মসলিন—*মলমল খাস*, *আব-ই-রওয়ান* (প্রবহমান পানি) এবং *শবনম* (ভোরের শিশির)। এই কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে ৫০ গজ দীর্ঘ একটি থান অনায়াসে একটি সাধারণ আংটির ভেতর দিয়ে পার করে দেওয়া যেত।
- **রেশম ও জাহাজ নির্মাণ:** কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদে হাজার হাজার রেশম কারখানা গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি চট্টগ্রামের ডকইয়ার্ডে সুলভ মূল্যে উন্নত মেহগনি ও সেগুন কাঠে তৈরি হতো সুবিশাল যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যিক জাহাজ—যা উসমানীয় খিলাফত ও ইউরোপের নৌবাহিনীতেও ব্যবহৃত হতো।
- **বারুদ তৈরিতে শোরা (সল্টপিটার):** সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপীয় সেনাবাহিনীগুলোর ব্যবহৃত কামানের বারুদের ৭০ শতাংশ উচ্চমানের পটাশিয়াম নাইট্রেট (শোরা) সরবরাহ করত বাংলা।

২. সুবাদার মীর জুমলা ও আসাম অভিযান (১৬৬০–১৬৬৩)

১৬৬০ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি **মীর জুমলা**-কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ঢাকায় অবস্থান করে মীর জুমলা মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ঢাকাকে রক্ষা করতে শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মুখে সোনারকান্দা, হাজীগঞ্জ ও ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করে জলসীমান্ত নিশ্ছিদ্র করেন।

১৬৬১ সালের নভেম্বরে মীর জুমলা ১২ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজার পদাতিক এবং ৩২৩টি রণতরী নিয়ে আসাম অভিমুখে এক অবিস্মরণীয় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোচবিহার জয় করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্য দিয়ে আসামের রাজধানী গড়গাঁও অধিকার করেন। এই অভিযানের স্মারক হিসেবে মীর জুমলার তৈরি বিশালাকার ব্রোঞ্জের কামান **বিবি মরিয়ম** আজও ঢাকার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত।

৩. শায়েস্তা খাঁর সোনালী যুগ: শান্তি ও প্রাচুর্য (১৬৬৪–১৬৮৮)

মীর জুমলার পর সুবাদার নিযুক্ত হন সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা **নবাব শায়েস্তা খাঁ**। তিনি প্রায় চব্বিশ বছর (১৬৬৪–১৬৭৮ ও ১৬৮০–১৬৮৮) দক্ষতার সাথে বাংলা শাসন করেন। শায়েস্তা খাঁর আমল ছিল মুঘল বাংলার মহিমান্বিত স্বর্ণযুগ:

- **চট্টগ্রাম বিজয় (১৬৬৬ খ্রি.):** দীর্ঘকাল ধরে আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা (হার্মাদ) বাংলার উপকূলীয় জনপদে লুণ্ঠন ও দাস ব্যবসা চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ১৬৬৫ সালে শায়েস্তা খাঁ এক বিশাল নৌ ও স্থল অভিযান পরিচালনা করেন। সন্দ্বীপের কাছে রক্তক্ষয়ী নৌযুদ্ধে মগ নৌবাহিনী ধ্বংস হয় এবং ১৬৬৬ সালের জানুয়ারিতে মুঘলরা চট্টগ্রাম দুর্গ জয় করে। শায়েস্তা খাঁ হাজার হাজার অপহৃত বাঙালি কৃষককে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন এবং চট্টগ্রামের নতুন নাম দেন **ইসলামাবাদ**।
- **ঢাকার লালবাগ কেল্লা ও অনন্য স্থাপত্য:** শায়েস্তা খাঁর সময়ে ঢাকায় নির্মিত হয় ঐতিহাসিক **লালবাগ কেল্লা** (কেল্লা আওরঙ্গবাদ), তাঁর প্রিয় কন্যা ইরান দুখতের মার্বেল পাথরে মোড়ানো অপূর্ব সমাধি **পরি বিবির মাজার**, ছোট কাটরা সরাইখানা

Shakil Mahmud • Research Monograph

এবং সাত গম্বুজ মসজিদ।

- **টাকায় আট মণ চাল:** শায়েস্তা খাঁর সুশাসনের ফলে কৃষিজ প্রাচুর্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মাত্র এক রৌপ্য টাকায় আট মণ (প্রায় ৩০০ কেজি) চাল পাওয়া যেত। তিনি ঢাকা ত্যাগ করার সময় নগরের পশ্চিম তোরণ বন্ধ করে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন —যে শাসক ভবিষ্যতে টাকায় আট মণ চালের ব্যবস্থা করতে পারবেন, কেবল তিনিই এই তোরণ পুনরায় উন্মুক্ত করবেন।

৪. ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও কলকাতার পত্তন

বাংলার বিপুল বাণিজ্যের লোভে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপের বৃহৎ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো ভাগীরথী নদীর তীরে একে একে কুঠি স্থাপন করে। ডাচরা চুঁচুড়ায়, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং ডেনিশরা শ্রীরামপুরে বসতি গড়ে তোলে।

১৬৯০ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি **জব চার্নক** ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে সুতানুটি গ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। সুবাদার ইব্রাহিম খানের কাছ থেকে কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিন গ্রামের জমিদারির স্বত্ব কিনে নেয় এবং সেখানে নির্মাণ করে **ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ**। একটি সামান্য বাণিজ্যিক কুঠি হিসেবে শুরু হলেও মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এই **কলকাতা** নগরীই পরিণত হয় সমগ্র ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে—যা শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতাকে গ্রাস করেছিল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া (১৬৭০)। *ট্রাভেলস ইন দ্য মোঘল এম্পায়ার*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- করিম, আবদুল (১৯৬৪)। *ঢাকা: দ্য মুঘল ক্যাপিটাল*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান।
- প্রকাশ, ওম (১৯৮৫)। *দ্য ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দ্য ইকোনমি অব বেঙ্গল*। প্রিন্সটন।
- সরকার, যদুনাথ (১৯৪৮)। *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল: ২য় খণ্ড*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সুবাহ বাংলা — বিশ্ববাণিজ্যের পরাশক্তি এবং "জান্নাতুল বিলাদ" বা ভূস্বর্গ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১০। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-10-subah-bangla-paradise-of-nations-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

বাংলার স্বাধীন নবাব ও পলাশীর ট্র্যাজেডি — মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭

বাংলার স্বাধীন নবাব ও পলাশীর ট্র্যাজেডি — মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭

1,016 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১১: *চিত্র: ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরের সাথে লর্ড ক্লাইভের বৈঠকের ঐতিহাসিক তৈলচিত্র—যার মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে।*

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে এক অবিস্মরণীয় বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্বের রক্তিম সূর্য। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর হাত ধরে যে বাংলা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তেইশ বছর বয়সী তরুণ দেশপ্রেমিক নবাব **সিরাজউদ্দৌলা**। কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধূর্ত সেনাপতি **রবার্ট ক্লাইভ**-এর সাথে হাত মিলিয়ে প্রধান সেনাপতি **মীর জাফর** এবং ধনকুবের ব্যাংকার **জগৎ শেঠ** যে জঘন্য দেশদ্রোহের জাল বুনেছিল, তার পরিণতিতে বাংলার ললাটে নেমে আসে প্রায় দুই শতকের ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও শোষণের কালো অধ্যায়।

১. স্বাধীন নবাবী: মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে আলীবর্দী খাঁ

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বাংলায় এক অনন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক বিপ্লব ঘটান **মুর্শিদ কুলি খাঁ**। ১৭১৭ সালে তিনি ঢাকাকে বিদায় জানিয়ে ভাগীরথীর তীরে **মুর্শিদাবাদ**-এ রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নামমাত্র মুঘল আনুগত্য বজায় রেখে কার্যত স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘মালগুজারি’ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতিকে

Shakil Mahmud • Research Monograph

সুদৃঢ় করেন।

পরবর্তীতে ১৭৪০ সালে সিংহাসনে বসেন সাহসী সেনানায়ক **নবাব আলীবর্দী খাঁ**। আলীবর্দীর ষোল বছরের শাসনকালের প্রধান সংকট ছিল মারাঠা **বর্গীদের রক্তক্ষয়ী আক্রমণ** (১৭৪১–১৭৫১ খ্রি.)। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে হাজার হাজার মারাঠা অশ্বারোহী প্রতি বছর বাংলায় ঢুকে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত এবং নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাত (যা বাঙালির বিখ্যাত ঘুমপাড়ানি গানে স্থান পেয়েছে: *“ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো / বর্গী এলো দেশে…”*)। আলীবর্দী বীরত্বের সাথে বর্গীদের প্রতিহত করেন এবং উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়ে শান্তিচুক্তি করেন।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে আলীবর্দী কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন: *“ইউরোপীয়রা মৌমাছির ন্যায়; তাহাদিগকে বিরক্ত না করিলে উহারা মধু দিবে, কিন্তু উহাদের চাকে হাত দিলে উহারা হুল ফুটাইয়া মারিয়া ফেলিবে।”*

২. সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ ও ইংরেজ সংঘাত

১৭৫৬ সালের এপ্রিলে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভালোবাসার দৌহিত্র তেইশ বছরের তরুণ **মির্জা মুহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা** মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি পরিবার ও দরবারের ষড়যন্ত্রের মুখে পড়েন—একদিকে খালা ঘসেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার শওকত জং, অপরদিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রকাশ্য ধৃষ্টতা:

- **অনুমতিহীন দুর্গ নির্মাণ:** ফরাসিদের সাথে যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অতিরিক্ত প্রাচীর ও কামান স্থাপন করে।
- **দস্তকের অপব্যবহার:** ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সরকারি ছাড়পত্র ‘দস্তক’ ব্যক্তিগত চোরাচালানে ব্যবহার করে নবাবের রাজকোষকে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করছিল।
- **রাজকোষের অর্থ তছরুপকারীকে আশ্রয়:** ঢাকার রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থ আত্মসাৎকারী কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা কলকাতায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে এবং নবাবের দূত নারায়ণ সিংহকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

সার্বভৌম কর্তৃত্ব রক্ষায় সিরাজ ১৭৫৬ সালের জুনে কলকাতা অভিযান চালিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন এবং ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকতে ব্রিটিশ চিকিৎসক জন যেফানিয়াহ হলওয়েল পরবর্তীতে **“অন্ধকূপ হত্যা” (Black Hole Tragedy)**-র কুখ্যাত রূপকথা বানিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রচার করেন যে একটি ১৮ ফুট কক্ষে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে ১২৩ জনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল—যা আধুনিক আন্তর্জাতিক গবেষকদের দ্বারা সম্পূর্ণ অসত্য ও যুদ্ধবাজ প্রোপাগান্ডা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. ক্লাইভ-মীর জাফর-জগৎ শেঠের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

১৭৫৬ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজ থেকে নৌবহর নিয়ে কলকাতায় আসেন ব্রিটিশ সেনাপতি **রবার্ট ক্লাইভ** ও অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন। ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং ফরাসিদের ঘাঁটি চন্দননগর দখল করেন। সিরাজের ৫০ হাজার সৈন্যের মুখোমুখি উন্মুক্ত যুদ্ধে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের লোভী ও ক্ষুব্ধ অমাত্যদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন নবাবের প্রধান সেনাপতি **মীর জাফর আলী খান**, ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যাংকার ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রক **জগৎ শেঠ মহাতাব রায়**, মহারাজা দুর্লভরাম (রায় দুর্লভ) এবং ধূর্ত ব্যবসায়ী **উমিচাঁদ (আমির চাঁদ)**। ১৭৫৭ সালের ৫ জুন স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়: যুদ্ধে মীর জাফর নিষ্ক্রিয় থাকবেন এবং সিরাজকে হটিয়ে ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাব বানাবে; বিনিময়ে কোম্পানি পাবে বিপুল অর্থ ও চব্বিশ পরগনার জমিদারি, আর ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে পাবেন লক্ষ লক্ষ পাউন্ড।

৪. পলাশীর আম্রকাননে ট্র্যাজেডি (২৩ জুন ১৭৫৭)

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকালবেলা। মুর্শিদাবাদ থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে পলাশীর লক্ষ্মণবাগের আম্রকাননে মুখোমুখি হয় দুই বাহিনী। নবাবের পক্ষে ছিল ৫০ হাজার সৈন্য (৩৫ হাজার পদাতিক ও ১৫ হাজার অশ্বারোহী) এবং ফরাসি গোলন্দাজ সিনফ্রের পরিচালনায় ৫৩টি ভারী কামান। অপরদিকে রবার্ট ক্লাইভের সাথে ছিল মাত্র ৯৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য, ২,১০০ জন দেশীয় সিপাহি এবং ১০টি হালকা কামান।

যুদ্ধের শুরুতে নবাবের বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি **মীর মদন** ও **মোহন লাল** বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের বিধ্বংসী কামানের মুখে ক্লাইভের বাহিনী দিশেহারা হয়ে আমবাগানের পরিখায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু দুপুর বারোটার দিকে হঠাৎ শুরু হয় মুষলধারে গ্রীষ্মের বৃষ্টি। ইংরেজরা ত্রিপল দিয়ে তাদের কামানের বারুদ ঢেকে রাখে, কিন্তু নবাবের অসতর্ক বাহিনী তা করতে ব্যর্থ হয়।

বৃষ্টি থামার পর ইংরেজদের বারুদ ভিজে গেছে ভেবে মীর মদন যখন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বীরদর্পে আক্রমণ চালান, তখন ইংরেজদের শুকনো কামান থেকে একঝাঁক গোলা এসে মীর মদনের বুকে বিদ্ধ হয়। বীর সেনাপতির শাহাদাতে তরুণ সিরাজ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি মীর জাফরকে ডেকে নিজের রাজকীয় পাগড়ি তাঁর পায়ের কাছে রেখে বাংলার স্বাধীনতারক্ষার জন্য আকুল মিনতি জানান:

> *“সিরাজ নিজের মাথার পাগড়ি খুলিয়া মীর জাফরের পায়ের সম্মুখে রাখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন: ‘আপনার কাছে আমি এই পাগড়ি ও আমার মান-সম্মান সঁপিয়া দিলাম। আপনি আমার মাতামহ আলীবর্দী খাঁর আজীবনের সঙ্গী; বাংলার এই চরম বিপদে দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আপনার।’ মীর জাফর পবিত্র কুরআনে হাত রাখিয়া যুদ্ধ করিবার শপথ করিলেন, কিন্তু তাঁবু হইতে বাহির হইয়াই গোপনে ক্লাইভকে সংবাদ পাঠাইলেন অবিলম্বে আক্রমণ করিতে এবং নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ছাউনিতে ফিরিবার পরামর্শ দিলেন।”*
>
> — ***গোলাম হোসেন সলিম**, রিয়াজ-উস-সালাতিন (১৭৮৮ খ্রি.)*

মোহন লালের বীর সৈন্যদল যখন প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্রধান সেনাপতির নির্দেশে যুদ্ধ থামিয়ে পিছিয়ে আসার হুকুম আসে। মুহূর্তে নবাবের বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। আর অন্যদিকে মীর জাফর, ইয়ার লতিফ ও রায় দুর্লভের অধীনে থাকা ৪০ হাজার সৈন্য কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল—একটি বন্দুকের গুলিও ছুড়ল না। ক্লাইভের অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় নবাবের বাহিনী।

বিশ্বাসঘাতকতার গভীরতা উপলব্ধি করে সিরাজ দ্রুত মুর্শিদাবাদে ফিরে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু সবাই তাঁকে ত্যাগ করে। অবশেষে পাটনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে রাজমহলের কাছে তিনি ধরা পড়েন। ১৭৫৭ সালের ২ জুলাই রাতে মীর জাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নির্মমভাবে বন্দি সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। পরদিন সিরাজের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মরদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপথে ঘোরানো হয়। সিরাজের পতনের সাথেই বাংলার স্বাধীনতার শেষ প্রদীপটি নিভে যায়—এবং সূচনা ঘটে প্রায় দুই শতাব্দীর এক নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শোষণের মহাকাব্য।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- হিল, এস. সি. (১৯০৫)। *বেঙ্গল ইন ১৭৫৬–১৭৫৭*। জন মারে, লন্ডন।
- সলিম, গোলাম হোসেন (১৭৮৮)। *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (অনুবাদ: আবদুস সালাম)। এশিয়াটিক সোসাইটি।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৭৭)। *দ্য মারাঠা সুপ্রিমেসি*। ভারতীয় বিদ্যাভবন।
- চৌধুরী, সুশীল (২০০০)। *দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার: পলাশী রেভোলিউশন অব ১৭৫৭*। মনোহর।
- গুপ্ত, বি. কে. (১৯৬৬)। *সিরাজউদ্দৌলা অ্যান্ড দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি*। ই. জে. ব্রিল, লাইডেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বাংলার স্বাধীন নবাব ও পলাশীর ট্র্যাজেডি — মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১১।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-11-nawabs-of-bengal-and-battle-of-plassey-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

কোম্পানির শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ

কোম্পানির শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ

967 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১২: *চিত্র: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক খোদাইচিত্র—যা ব্যারাকপুরে শুরু হয়ে ঢাকার লালবাগ দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।*

পলাশীর যুদ্ধের করুণ পরিণতির পর বাংলায় সূচিত হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় এক শতাব্দী দীর্ঘ চরম অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ধ্বংস এবং মানব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ের পর ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে রবার্ট ক্লাইভ আদায় করেন **দেওয়ানি সনদ**, যার মধ্য দিয়ে কায়েম হয় কুখ্যাত ‘দ্বৈত শাসন’। মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় কোম্পানির এই নির্দয় রাজস্ব শোষণের ফলে ঘটে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রি.)**—যেখানে এক কোটি নিরপরাধ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু বাংলার মানুষ এই অন্যায় দাসত্বকে নীরবে মেনে নেয়নি; ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তিতুমীরের ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা, সাঁওতাল হুল এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি ধূলিকণা রঞ্জিত হয়েছিল প্রতিরোধের রক্তে।

১. ১৭৬৫-র দেওয়ানি লাভ ও ‘বাংলার লুণ্ঠন’

১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে **বক্সারের যুদ্ধে** বাংলার সাবেক নবাব মীর কাসিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিতে পরিণত হয়। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট এলাহাবাদের এক তাবু দরবারে সম্রাট শাহ আলম ব্রিটিশ কোম্পানির লর্ড ক্লাইভের হাতে চিরস্থায়ী **দেওয়ানি সনদ**

Shakil Mahmud • Research Monograph

তুলে দিতে বাধ্য হন—যার ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত রাজস্ব আদায়ের একচ্ছত্র মালিকানা চলে যায় ইংরেজদের হাতে।

ক্লাইভ প্রতিষ্ঠা করেন কুখ্যাত **দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা**: সমস্ত রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে, কিন্তু জনগণের জানমালের সুরক্ষা ও প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব তারা নেয়নি; আর নামমাত্র পুতুল নবাবের ওপর থাকে দায়িত্ব, কিন্তু একটি পয়সাও রাজস্বের অধিকার থাকে না। কোম্পানির রাজস্ব আদায় ছিল দানবীয়: খাজনা দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং লবণ ও চালের মতো মৌলিক পণ্যের ব্যবসা ইংরেজরা একচেটিয়া করে নেয়। এর ফলে কোটি কোটি পাউন্ডের সম্পদ বাংলা থেকে পাচার হয়ে সরাসরি লন্ডনে চলে যায়—যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেছেন **“সম্পদ পাচার” (Drain of Wealth)**।

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মহাপ্রলয় (১৭৭০ খ্রি.)

১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতি হলে কোম্পানির নির্দয় কর আদায়ের মুখে নেমে আসে এশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহতম কৃত্রিম মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ: বাংলা ১১৭৬ সালের **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর**। খাজনা মওকুফ কিংবা প্রজাদের সাহায্য করার পরিবর্তে কোম্পানির কর্মকর্তারা বেয়নেট ঠেকিয়ে অনাহারক্লিষ্ট কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে এবং চালের মজুত গড়ে তুলে কৃত্রিম সংকটের মাধ্যমে কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

এর পরিণতি ছিল বীভৎস। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ—প্রায় **এক কোটি মানুষ**—অনাহারে ও মহামারীতে তিলে তিলে মারা যায়। গ্রামকে গ্রাম জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়, ধানক্ষেতগুলো বিরান জঙ্গলে রূপ নেয় এবং ভাগীরথী, পদ্মা ও বুড়িগঙ্গার পানিতে ভেসে যায় লাখ লাখ বেওয়ারিশ লাশ। এত বিপুল মানুষের মৃত্যুর পরও কোম্পানির পরিচালক বোর্ড লন্ডনে গর্ব করে চিঠি লিখেছিল যে, এক-তৃতীয়াংশ প্রজা মারা গেলেও ১৭৭১ সালে পূর্ববর্তী বছরের চেয়েও বেশি খাজনা আদায় করা হয়েছে!

৩. লর্ড কর্নওয়ালিস ও ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

একটি অনুগত ভূস্বামী শ্রেণি তৈরি এবং প্রতি বছর নির্দিষ্ট রাজস্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৯৩ সালে গভর্নর-জেনারেল **লর্ড কর্নওয়ালিস** বাংলায় জারি করেন **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**। এই আইনের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার শিকড় উপড়ে ফেলা হয়:

- ঐতিহ্যবাহী খাজনা আদায়কারী এবং কোম্পানির সুবিধাভোগী দালালদের ভূমির চিরস্থায়ী মালিক বা *জমিদার* বানিয়ে দেওয়া হয়।
- যে সাধারণ কৃষকরা হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় মাটির প্রকৃত মালিক ছিল, রাতারাতি তারা পরিণত হয় জমিদারের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাহীন প্রজাতে। তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নানাবিধ অবৈধ কর (আবওয়াব) এবং মহাজনের চড়া সুদের শৃঙ্খল।
- জমিদার যদি বছরের নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে ব্রিটিশ কালেক্টরের কাছে নির্দিষ্ট খাজনা জমা দিতে ব্যর্থ হতো, তবে তার জমিদারি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হতো (*সূর্যাস্ত আইন*)। এর ফলে কলকাতায় জন্ম নেয় এক নতুন পরজীবী ‘অনুপস্থিত জমিদার’ (Absentee Landlord) শ্রেণি, যাদের সাথে বাংলার মাটির কোনো আত্মিক সম্পর্ক ছিল না।

৪. গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ: ফকির-সন্ন্যাসী থেকে তিতুমীর

এই অসহনীয় ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সমাজ বারবার অস্ত্র তুলে নেয়:

- **ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩–১৮০০):** মজনু শাহ, ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে সন্ন্যাসী ও ফকিররা উত্তরবঙ্গের অরণ্য থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করতেন, অস্ত্র ও শস্য লুট করে ক্ষুধার্ত কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।
- **তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা (১৮৩১ খ্রি.):** চব্বিশ পরগনার নারকেলবাড়িয়ায় **সৈয়দ মীর নিসার আলী (তিতুমীর)** ইংরেজ নীলকর এবং জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের মতো অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সমাজকে সংগঠিত করেন। তিনি কৃষকদের

ওপর আরোপিত অন্যায় দাড়ি কাটার কর প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন এবং নারকেলবাড়িয়ায় তৈরি করেন বিখ্যাত **বাঁশের কেল্লা**। সেখানে তিনি স্বাধীন সরকার ঘোষণা করেন। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর ব্রিটিশ মেজর স্কটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারী কামান ও আধুনিক রাইফেলের আক্রমণে তিতুমীর বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

- **ফরায়েজি আন্দোলন:** ফরিদপুরে হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র **দুদু মিয়া**-র নেতৃত্বে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ঘোষণা করা হয়: *"সমস্ত জমির প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ; কোনো জমিদারের অধিকার নেই আল্লাহর জমিনের ওপর অন্যায় কর চাপানোর।"*
- **সাঁওতাল হুল (১৮৫৫ খ্রি.):** রাজমহল পাহাড়ের চার বীর ভাই—**সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব**-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসী তীর-ধনুক নিয়ে ইংরেজ ও মহাজনদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ গড়ে তোলে।

৫. বাংলায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও লালবাগ দুর্গের যুদ্ধ

পলাশীর ঠিক একশত বছর পর ভারতীয় সিপাহি ও জনতার দীর্ঘ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ে **১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহি বিপ্লবে**। এই মহাবিপ্লবের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল বাংলার মাটিতেই: ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতার নিকটবর্তী **ব্যারাকপুর** সেনানিবাসে ৩৪তম বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির বীর সিপাহি **মঙ্গল পাণ্ডে** ইংরেজ অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রথম গুলি চালিয়ে ডাক দেন মুক্তির লড়াইয়ের।

এই বিদ্রোহ দ্রুত পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকার **লালবাগ কেল্লা**-য় অবস্থানরত ৭৩তম নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির বাঙালি ও ভারতীয় সিপাহিরা ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। লালবাগের প্রাঙ্গণে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বহু সিপাহি শহীদ হন এবং বন্দি ৪১ জন মুক্তিকামী সিপাহিকে ঢাকার **আন্টাঘর ময়দানে** (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক / ভিক্টোরিয়া পার্ক) প্রকাশ্যে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে ইংরেজরা এক নারকীয় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। যদিও সামরিক শক্তিতে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়, কিন্তু এর ফলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একশত বছরের শোষণমূলক শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটিশ রানি সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- হান্টার, উইলিয়াম উইলসন (১৮৬৮)। *দ্য অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল*। লন্ডন।
- চন্দ্র, বিপান (১৯৬৬)। *দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকোনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া*। নতুন দিল্লি।
- গুহ, রণজিৎ (১৯৮৩)। *এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজেন্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*। অক্সফোর্ড।
- সেন, সুরেন্দ্রনাথ (১৯৫৭)। *এইটিন ফিফটি-সেভেন*। ভারত সরকার।
- ভদ্র, গৌতম (১৯৮৩)। *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*। সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কোম্পানির শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং গ্রামীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১২।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-12-company-rule-famine-and-rebellion-bn/

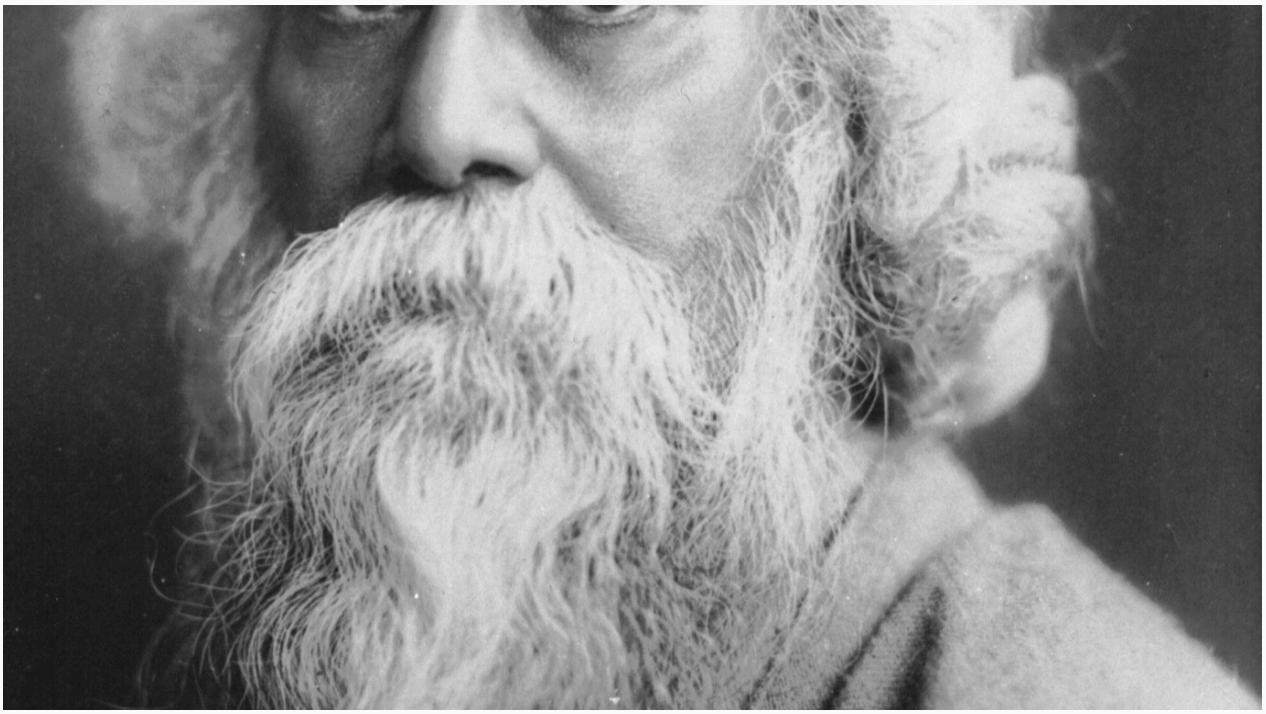
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

বাংলার নবজাগরণ — বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয়ী পথিকৃৎ

বাংলার নবজাগরণ — বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয়ী পথিকৃৎ

835 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৩: *চিত্র: নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি (১৯১৩)— বাংলার নবজাগরণের অবিসংবাদিত সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী দার্শনিক।*

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের চরম অর্থনৈতিক শোষণের মাঝেও বাংলার মাটি জন্ম দিয়েছিল আধুনিক বিশ্বের অন্যতম মহিমান্বিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব: **বাংলার নবজাগরণ** (Bengal Renaissance)। প্রাচ্যের শাশ্বত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দর্শনের এক যুগান্তকারী মিলনে এই নবজাগরণ প্রাচীন কুসংস্কার ও সামাজিক অন্ধত্বকে চূর্ণ করে দেয়। এই যুগেই সৃষ্টি হয় আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে ঘটে বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো দুই অমর যুগপুরুষ—যাঁরা বাঙালির আত্মাকে চিরকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্তমনা করে তুলেছিলেন।

১. রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় পথিকৃৎ

বাংলার নবজাগরণের প্রথম আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন অনন্য মনীষী **রাজা রামমোহন রায়** (১৭৭২–১৮৩৩)। সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, হিব্রু, গ্রিক ও ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত রামমোহন প্রমাণ করেছিলেন যে উপনিষদের মূল শিক্ষা হলো এক সর্বজনীন, নিরাকার ও যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ।

রামমোহনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বিজয় ছিল হিন্দু বিধবাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বর্বরোচিত প্রথা **সতীদাহ নিবারণ**। তাঁর নিরলস শাস্ত্রীয় বিতর্ক ও সামাজিক আন্দোলনের মুখে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক **১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন** পাস করতে বাধ্য হন। ১৮২৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন *ব্রাহ্মসমাজ*, আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক লড়াই করেন—যে কারণে তাঁকে বলা হয় “আধুনিক ভারতের জনক”।

ইয়ং বেঙ্গল ও হেনরি ডিরোজিওর বিপ্লবী যৌবন

১৮২০-এর দশকে কলকাতার হিন্দু কলেজের তরুণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষক ও কবি **হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও** (১৮০৯–১৮৩১)-র অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের দল **ইয়ং বেঙ্গল** (Young Bengal)। মুক্তচিন্তা, অজ্ঞেয়বাদ এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন বিদ্রোহ হিন্দু সমাজের গোঁড়া রীতিনীতির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ডিরোজিও শিখিয়েছিলেন সত্যকে কোনো প্রাচীন শাস্ত্রের অন্ধত্বে নয়, মানুষের নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: করুণার সিন্ধু ও সমাজ সংস্কারক

রামমোহন যদি নবজাগরণের তাত্ত্বিক হন, তবে **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** (১৮২০–১৮৯১) ছিলেন এর আপসহীন কর্মবীর—বাঙালির চিরকালীন ‘দয়ার সাগর’। মেদিনীপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে নিজ মেধা ও আত্মমর্যাদাবলে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন।

তৎকালীন সমাজে অবুঝ শিশুকন্যাদের বিধবা হওয়ার পর যে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে হতো, তা দেখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। তিনি পরাশর সংহিতা ঘেঁটে প্রমাণ করেন যে শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। গোঁড়া সমাজের প্রাণনাশের হুমকি উপেক্ষা করে তিনি **১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন** পাস করান। পাশাপাশি তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সাথে কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নিজ খরচে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সুবিন্যস্ত করেন এবং রচনা করেন বাঙালির মাতৃভাষা শিক্ষার আদিপাঠ *বর্ণপরিচয়*।

৩. বাংলা সাহিত্যের মহাবিস্ফোরণ: মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র

নবজাগরণের ছোঁয়ায় বাংলা ভাষা মধ্যযুগীয় পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সমকক্ষ হয়ে ওঠে:

- **মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩):** এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান বিদ্রোহী কবি। তিনি বাংলা কবিতায় প্রবেশ করান অমিত্রাক্ষর ছন্দ (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স), চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) এবং পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি। তাঁর মহাকাব্য **মেঘনাদবধ কাব্য** (১৮৬১)-এ রামায়ণের চরিত্রগুলোকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্টে দিয়ে দেশপ্রেমিক বীর মেঘনাদকে এক ট্র্যাজিক মহাবীর হিসেবে তুলে ধরা হয়।
- **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪):** বাংলা উপন্যাসের জনক। *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা* এবং *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে বিপ্লব ঘটান। তাঁর রচিত **বন্দে মাতরম্** গানটি সমগ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল রণধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল।
- **মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১২):** উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক। কারবালার বিষাদময় রক্তক্ষয়ী ইতিহাস নিয়ে রচিত তাঁর কালজয়ী উপন্যাস **বিষাদ-সিন্ধু** বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ।

৪. বিজ্ঞানের রাজদরবারে বাঙালি: জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুই বাঙালি বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে ঔপনিবেশিক দাসত্ব বাঙালির প্রতিভাকে বেঁধে রাখতে পারে না:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮–১৯৩৭):** বেতার যোগাযোগ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিশ্বনন্দিত জনক। ১৮৯৫ সালে কলকাতার টাউন হলে তিনি বিশ্বের প্রথম মাইক্রোওয়েভ ও মিলিমিটার তরঙ্গ (৬০ গিগাহার্টজ) ব্যবহার করে দেওয়াল ভেদ করে গানপাউডারে বিস্ফোরণ ঘটান—যা মারকোনির বহু পূর্বে সফল হয়েছিল। তিনি আবিষ্কার করেন *ক্রেসকোগ্রাফ* যন্ত্র, যার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে প্রাণীদের মতো উদ্ভিদেরও সংবেদনশীলতা ও ব্যথা অনুভবের ক্ষমতা রয়েছে।
- **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১–১৯৪৪):** ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের জনক। ১৮৯৬ সালে মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হন। পরাধীন ভারতে যুবকদের পরনির্ভরশীলতা ঘোচাতে তিনি ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন **বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস**—যা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম দেশীয় ওষুধ কারখানা।

৫. বিশ্বমহাকাশে দুই সূর্য: রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

বাংলার নবজাগরণের মহোচ্চ শিখর ছিলেন দুই চিরন্তন কবি—যাঁরা বাঙালির আবেগের দুটি চোখ:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১): ১৯১৩ সালে তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলি*-র জন্য তিনি প্রথম অ-ইউরোপীয় হিসেবে **সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার** লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র কবি, যাঁর রচিত দুটি গান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে—বাংলাদেশের *আমার সোনার বাংলা* এবং ভারতের *জনগণমন-অধিনায়ক*।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬): চিরকালীন 'বিদ্রোহী কবি'। ১৯২২ সালে প্রকাশিত তাঁর ধূমকেতুসম কবিতা *বিদ্রোহী* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে গর্জে উঠেছিল:

> *"বলো বীর—*
> *বলো উন্নত মম শির!*
> *শির নেহারি' আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!"*
> *— **কাজী নজরুল ইসলাম**, বিদ্রোহী (১৯২২)*

নজরুল চার সহস্রাধিক গান রচনা করে বাংলা সঙ্গীতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এবং নজরুলের আপসহীন সাম্যবাদী বিদ্রোহ—এই দুই শক্তির ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালির মুক্তির অবিনাশী চেতনা।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- সরকার, সুমিত (১৯৭০)। *দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস অ্যান্ড আদার এসেজ*। পিপলস পাবলিশিং হাউস।
- দত্ত ও রবিনসন (১৯৯৫)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দ্য মিরিয়াড-মাইন্ডেড ম্যান*। সেন্ট মার্টিন্স প্রেস।
- মুজফ্‌ফর আহমদ (১৯৬০)। *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
- সেন, অমিয় (১৯৯৩)। *হিন্দু রিভাইভালিজম ইন বেঙ্গল: ১৮৭২–১৯০৫*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৮২)। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বাংলার নবজাগরণ — বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয়ী পথিকৃৎ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৩। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-13-bengal-renaissance-and-enlightenment-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব — মাস্টারদা থেকে নেতাজি

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব — মাস্টারদা থেকে নেতাজি

840 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৪: *চিত্র: চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পুলিশ অস্ত্রাগার, যা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর বিপ্লবী সহযোদ্ধারা দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে দখল করেছিলেন।*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক বাংলাকে পরিণত করেছিল ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ রণক্ষেত্রে। ১৯০৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার মিথ্যা অজুহাতে বাংলাকে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের ভিত্তিতে বিভক্ত করার কুখ্যাত ষড়যন্ত্র আঁটেন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে বাংলার লক্ষ কোটি মানুষ, সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক **স্বদেশী আন্দোলন** এবং জন্ম নেয় একদল দুঃসাহসী সশস্ত্র বিপ্লবী—যাঁদের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন **মাস্টারদা সূর্য সেন**। ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক **চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ**-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া এই বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ এবং **নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু**-র আপসহীন নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিল।

১. কার্জনের বিভেদনীতি ও ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ

১৯০০ সালের দিকে ব্রিটিশ শাসকরা অনুভব করে যে শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ. এইচ. রিজলি এক গোপন নোটে লিখেছিলেন: *“ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি মহাশক্তি; বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে টানাটানি করবে... আমাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এই*

Shakil Mahmud • Research Monograph

ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত ও দুর্বল করে দেওয়া।”

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় **পূর্ববঙ্গ ও আসাম** প্রদেশ (রাজধানী ঢাকা) এবং অপর অংশ থাকে **পশ্চিমবঙ্গ** (রাজধানী কলকাতা)। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃত্ব—বিশেষ করে **নবাব স্যার সলিমুল্লাহ**—এই সিদ্ধান্তকে পূর্ববঙ্গের অনুন্নত জনগণের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা প্রসারের সুযোগ হিসেবে স্বাগত জানান। কিন্তু কলকাতার জাতীয়তাবাদী নেতারা একে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তীব্র আন্দোলনের ডাক দেন।

২. স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম লীগের জন্ম

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলায় শুরু হয় এক উত্তাল গণআন্দোলন—**স্বদেশী আন্দোলন**। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলায় পালিত হয় অরন্ধন দিবস। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে রাজপথে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ; কবি রচনা করেন তাঁর অমর গান *“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি”* এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় রাখি।

এই আন্দোলনে শুরু হয় বিলিতি পণ্য বর্জন, ম্যানচেস্টারের কাপড় ও লিভারপুলের লবণে অগ্নিসংযোগ এবং নিজস্ব তাঁতশিল্প ও সাবান তৈরির দেশীয় কারখানা স্থাপন।

একই সাথে পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার তাগিদে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। **১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর** এই ঐতিহাসিক সম্মেলনেই প্রতিষ্ঠিত হয় **নিখিল ভারত মুসলিম লীগ**—যা চার দশক পরে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র নতুন করে এঁকেছিল।

তুমুল গণআন্দোলন ও বিপ্লবী সন্ত্রাসের মুখে টিকতে না পেরে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ **বঙ্গভঙ্গ রদ** ঘোষণা করেন এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ক্ষুব্ধ পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশরা ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**—যা পরবর্তীকালে পরিণত হয় বাঙালির সমস্ত আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বাতিঘরে।

৩. সশস্ত্র বিপ্লব: অনুশীলন সমিতি ও মাস্টারদা সূর্য সেন

সংবিধান মেনে আবেদনের রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে বাংলার হাজার হাজার তরুণ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। ঢাকায় পুলিন বিহারী দাসের **অনুশীলন সমিতি** এবং কলকাতায় বাঘা যতীনের **যুগান্তর** দল গোপনে বোমা তৈরি ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের হত্যায় নিয়োজিত হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয় **১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল** চট্টগ্রামের মাটিতে। শিক্ষকতার কারণে যিনি সবার প্রিয় **মাস্টারদা** নামে পরিচিত ছিলেন, সেই মহানায়ক **সূর্য সেন**-এর নেতৃত্বে *ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি*-র বিপ্লবীরা এক অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন:

- ১৮ এপ্রিল রাতে বিপ্লবীরা একসাথে দামপাড়া পুলিশ অস্ত্রাগার, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ ভবন দখল করেন এবং রেললাইন কেটে দিয়ে চট্টগ্রামকে বাকি বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেন।
- অস্ত্রাগার দখল করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক মাস্টারদা সূর্য সেন ঘোষণা করেন **স্বাধীন ভারতের প্রথম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার**।
- ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শত শত সুসজ্জিত সেনাকে পর্যুদস্ত করেন মাত্র কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী। এই যুদ্ধে টেগরা (হরিগোপাল বল), ত্রিপুরা সেন সহ বারো জন কিশোর বিপ্লবী বীরের মতো শাহাদাত বরণ করেন।

- **বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার:** ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাবে (যেখানে লেখা থাকত: "কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ") সফল সশস্ত্র অভিযান চালান মাস্টারদার স্নেহধন্যা ২১ বছর বয়সী বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আহত অবস্থায় ইংরেজদের হাতে বন্দিত্ব এড়াতে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন এবং হন ভারতের প্রথম নারী শহীদ।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে মাস্টারদা গ্রেপ্তার হন। অমানুষিক নির্যাতন করে তাঁর দাঁত ও নখ উপড়ে ফেলার পর ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে চট্টগ্রাম কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর মরদেহ লোহার খাঁচায় ভরে গোপনে বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর এই আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতবর্ষের যুবসমাজকে মুক্তির আগুনে প্রজ্বলিত করে তোলে।

৪. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্নিপথ

বাংলার আরেক বিশ্বকাঁপানো সন্তান ছিলেন **নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু** (১৮৯৭–১৯৪৫)। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি আপসহীন সংগ্রামের ডাক দেন। গান্ধীর অহিংস নীতির সাথে মতভেদের কারণে তিনি পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।

ইংরেজরা তাঁকে কলকাতায় গৃহবন্দি করলে ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে তিনি পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে এক মহাকাব্যিক অন্তর্ধান সম্পন্ন করেন। ছদ্মবেশে কাবুল ও মস্কো হয়ে তিনি বার্লিনে পৌঁছান এবং সাবমেরিনে পাড়ি দিয়ে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি গড়ে তোলেন ৬০ হাজার সেনার **আজাদ হিন্দ ফৌজ (INA)** এবং ডাক দেন: *"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব!"* ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্মা সীমান্ত পার হয়ে মনিপুরের মৈরাংয়ে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে। এই সংগ্রামের পরই ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে ভারতীয় সেনাদের বন্দুক দিয়ে আর ভারতবর্ষ শাসন করা অসম্ভব।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- সরকার, সুমিত (১৯৭৩)। *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল: ১৯০৩–১৯০৮*। নতুন দিল্লি।
- গর্ডন, লিওনার্ড এ. (১৯৯০)। *ব্রাদার্স এগেইনস্ট দ্য রাজ: শরৎ ও সুভাষচন্দ্র বসু*। ভাইকিং।
- চক্রবর্তী, গণেশ (১৯৭৪)। *সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন*। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- রায়, রজতকান্ত (১৯৮৪)। *সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*। অক্সফোর্ড।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব — মাস্টারদা থেকে নেতাজি"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৪।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-14-partition-of-1905-swadeshi-and-revolutionaries-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

মহাপ্রলয়ঙ্কর দশক — ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগ

মহাপ্রলয়ঙ্কর দশক — ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগ

888 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৫: *চিত্র: ১৯৪৩ সালের মনুষ্যসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঐতিহাসিক আর্কাইভ ছবি (দ্য স্টেটসম্যান, আগস্ট ১৯৪৩)—১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্বে যে দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল ৩০ লক্ষাধিক মানুষ।*

১৯৪০ থেকে ১৯৫০—এই একটি দশক ছিল বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে সংঘাতময়, রক্তাপ্লুত ও ট্র্যাজিক অধ্যায়। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপন করেন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব, যা প্রাচ্যে স্বাধীন সার্বভৌম ‘রাষ্ট্রসমূহ’ গঠনের রূপরেখা দিয়েছিল। এর মাত্র তিন বছর পর উইনস্টন চার্চিলের ঔপনিবেশিক নীতির বলি হয়ে ১৯৪৩ সালের **পঞ্চাশের মন্বন্তরে** অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ নিরীহ বাঙালি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গড়ার শেষ স্বপ্নের অপমৃত্যুর পর **১৯৪৭ সালের আগস্টে** এক ব্রিটিশ আইনজীবীর কলমের খোঁচায় ঘটে দেশভাগের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি—যা বাংলার বুক চিরে কোটি মানুষের রক্ত ও চোখের জলে এক চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

১. ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব ও শেরে বাংলা

১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় জননায়ক ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী **শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক**। প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনি ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে তিনি বাংলার লক্ষ লক্ষ ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে লক্ষাধিক মানুষের সামনে ঐতিহাসিক **লাহোর প্রস্তাব** উত্থাপন করেন বাংলার শেরে বাংলা। প্রস্তাবের মূল অংশে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক ভাষায় বলা হয়েছিল:

> *“নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে... ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করিতে হইবে; যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল, সেই অঞ্চলগুলোকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে গঠিত ইউনিটগুলো হইবে **‘স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ’ (Independent States)**।”*
> — ***লাহোর প্রস্তাবের মূল বয়ান** (২৩ মার্চ ১৯৪০)*

লাহোর প্রস্তাবে ব্যবহৃত বহুবচন **“States” (রাষ্ট্রসমূহ)** কথাটি ছিল বাঙালির ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার বীজ। এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা ও আসাম হবে একটি সম্পূর্ণ পৃথক, সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র—যা উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব বা সিন্ধুর অধীনস্থ হবে না। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে দিল্লির কনভেনশনে জিন্না ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ড কূটকৌশলে “States”-এর জায়গায় একক “State” বানিয়ে দিয়েছিলেন—যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি করে।

২. চার্চিলের মানবসৃষ্ট মহামারী: ১৯৪৩-এর মন্বন্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় নেমে আসে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের এক কালরাত: বাংলা ১৩৫০ সালের **পঞ্চাশের মন্বন্তর**। আধুনিক গবেষক এবং নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এই দুর্ভিক্ষ ফসলের অভাবে নয়, বরং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **উইনস্টন চার্চিলের** বর্ণবাদী ও নিষ্ঠুর যুদ্ধনীতির প্রত্যক্ষ কারণে ঘটেছিল।

১৯৪২ সালে জাপানিরা বার্মা দখল করলে ব্রিটিশরা বাংলায় সম্ভাব্য জাপানি অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ‘পোড়ামাটি নীতি’ বা *ডেনায়েল পলিসি* গ্রহণ করে। তারা উপকূলীয় অঞ্চলের ২৫ হাজারের বেশি ধান ও খাদ্য পরিবহনের নৌকা জ্বালিয়ে দেয় এবং সমস্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করে। একই সাথে ব্রিটিশ যুদ্ধ মন্ত্রিসভা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা জাহাজের গম ক্ষুধার্ত বাংলায় না দিয়ে ভূমধ্যসাগরে তাদের ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য গুদামজাত করে রাখে। ভাইসরয় ওয়াভেলের বারবার পাঠানো ত্রাণের আবেদন চার্চিল নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এর ফলে কলকাতার রাজপথ থেকে শুরু করে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে **প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ** অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। ফুটপাতে কঙ্কালসার মায়ের শুকনো স্তন চিবিয়ে দুধের শিশুর মৃত্যুর সেই মর্মান্তিক দৃশ্য কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের অভিজাত ভোজের পাশেই উন্মোচিত হয়েছিল। এই নারকীয় মানবসৃষ্ট ট্র্যাজেডিকে বিশ্ববাসীর চোখে চিরতরে তুলে ধরেছিলেন শিল্পাচার্য **জয়নুল আবেদিন**। সস্তা প্যাকিং কাগজের ওপর চাইনিজ কালির মোটা টানে আঁকা তাঁর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক মহাকাব্যিক চিত্রদলিল।

৩. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ‘অখণ্ড স্বাধীন বাংলা’র স্বপ্নভঙ্গ

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ (ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে)-এর দিনে কলকাতায় শুরু হয় স্মরণকালের সবচেয়ে নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—**গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং**। বাহাত্তর ঘণ্টায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং এই রক্তক্ষয় নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। নোয়াখালীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মহাত্মা গান্ধী নগ্নপদে হেঁটে গ্রামে গ্রামে শান্তি মিশন পরিচালনা করেন।

এই রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার মাঝেও বাংলার হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব রক্ষায় এক অনন্য সাহসী উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী**, প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা **শরৎচন্দ্র বসু** (নেতাজির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতা **আবুল হাশিম**। ১৯৪৭ সালের মে মাসে তাঁরা যৌথভাবে উত্থাপন করেন **অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা** (United

Shakil Mahmud • Research Monograph

Independent Bengal):

> *“বাংলা হইবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখণ্ড রাষ্ট্র। ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে বা পাকিস্তানের সাথে বাংলা কী সম্পর্ক রাখিবে, তাহা স্বাধীন বাংলার জনগণ নির্ধারণ করিবে… হাজার বছরের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম কোনো বহিরাগত দূরবর্তী শক্তির ক্রীড়নক হইবে না।”*
> *— **শরৎ বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি** (২০ মে ১৯৪৭)*

মুহাম্মদ আলী জিন্না এই প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি জানালেও জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস হাইকমান্ড এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। তাঁরা জানিয়ে দেন যে ভারত ভাগ হলে বাংলা এবং পাঞ্জাবকেও ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে।

৪. ১৯৪৭-এর রক্তক্ষয়ী দেশভাগ ও ছিন্নমূল কান্না

সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এক ব্রিটিশ আইনজীবী **স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ**-কে, যিনি এর আগে কোনোদিন ভারতে পা রাখেননি। তীব্র গরমে মাত্র ৩৬ দিনে পুরোনো আদমশুমারি ও মানচিত্রের ওপর লাল কালির দাগ টেনে তিনি বিভক্ত করে দেন হাজার বছরের এক অখণ্ড ভূগোল।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট রাতারাতি জন্ম নেয় দুটি দেশ। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়: হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ **পশ্চিমবঙ্গ** চলে যায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ **পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান)** পরিণত হয় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরের পাকিস্তানের এক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে।

লাখ লাখ বাঙালি রাতারাতি শরণার্থীতে পরিণত হয়। ভিটেমাটি ফেলে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নেওয়া শত শত হিন্দু পরিবার আর ওপার থেকে আসা মুসলিম মুহাজিরদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। হাজার বছরের এক অভিন্ন সংস্কৃতি কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দি হলো। কিন্তু দেশভাগের প্রথম দিন থেকেই পূর্ববঙ্গের সচেতন মানুষ বুঝতে পেরেছিল: সাদা চামড়ার ব্রিটিশদের বিদায় দিয়ে তারা কেবল লাভ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি খাকি উর্দির এক নতুন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- সেন, অমর্ত্য (১৯৮১)। *পভার্টি অ্যান্ড ফ্যামিন্স*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- মুখার্জি, মধুশ্রী (২০১০)। *চার্চিলস সিক্রেট ওয়ার*। বেসিক বুকস।
- চ্যাটার্জি, জয়া (১৯৯৪)। *বেঙ্গল ডিভাইডেড: হিন্দু কমিউনালাইজম অ্যান্ড পার্টিশন*। কেমব্রিজ।
- হাশিম, আবুল (১৯৭৪)। *ইন রেট্রোস্পেক্ট*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- মনসুর আহমদ, আবুল (১৯৬৯)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। নওরোয কিতাবিস্তান।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মহাপ্রলয়ঙ্কর দশক — ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৫। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-15-lahore-resolution-1943-famine-and-1947-partition-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিকুণ্ড — ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা

পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিকুণ্ড — ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা

1,053 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৬: *চিত্র: ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার—১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অমর ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত জাতীয় শোক ও চেতনার চিরন্তন স্মারক।*

১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান নামক অবাস্তব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রটির জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের জনগণ বুঝতে পারে যে তারা ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়নি, বরং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এক নিষ্ঠুর অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে বন্দি হয়েছে। পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং বাংলার সোনালী আঁশ পাটের রপ্তানি আয় লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি ও ইসলামাবাদ গড়ে তোলা হয়। যখন এই শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষাকে মুছে ফেলার ধৃষ্টতা দেখায়, তখনই সূচিত হয় **১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলন**। রক্তে ভেজা সেই আত্মত্যাগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়—যার ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্টের বিজয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **ঐতিহাসিক ছয় দফা** এবং ১৯৬৯ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ভিত চিরতরে চূর্ণ হয়ে যায়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১. অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও মহান ভাষা আন্দোলন (১৯৫২ খ্রি.)

দেশভাগের পরমুহূর্ত থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর-জেনারেল **মুহাম্মদ আলী জিন্না** অহংকার করে ঘোষণা করেন:

> *“আমি আপনাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে একমাত্র উর্দু এবং অন্য কোনো ভাষা নহে। যে ব্যক্তি আপনাদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবে, সে বাস্তবিকই পাকিস্তানের শত্রু।”*
> — ***মুহাম্মদ আলী জিন্না**, কার্জন হলের ভাষণ (২৪ মার্চ ১৯৪৮)*

কার্জন হলের সেই মুহূর্তেই তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমবেত ছাত্ররা বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে: *“না! না! না!”* সমগ্র দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষের উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বাঙালি মেনে নেয়নি।

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে সমগ্র পূর্ববঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ **১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮)** দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে দশজন দশজন করে মিছিল বের করে ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পৌঁছামাত্র পুলিশ মিছিলে নির্বিচারে তাজা গুলি বর্ষণ করে। রাজপথ রঞ্জিত হয় **আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুস সালাম এবং নয় বছরের কিশোর অহিউল্লাহ ও শফিউর রহমানের** তাজা রক্তে। পরদিন রাতেই ছাত্ররা গড়ে তোলে প্রথম **শহীদ মিনার**, যা পুলিশ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। আবদুল গাফফার চৌধুরীর অমর গান বাঙালির জাতীয় শোকগীতিকায় রূপ নেয়:

> *“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি...”*

রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি ভাষার দাবিকে অতিক্রম করে রূপান্তরিত হয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। বাধ্য হয়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাঙালির এই আত্মত্যাগকে চিরস্মরণীয় করে তোলে।

২. ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্টের মহাবিজয় ও সামরিক শাসন

১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় **যুক্তফ্রন্ট**। তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ঐতিহাসিক ২১ দফা—যার মূল দাবি ছিল পূর্ববঙ্গের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

নির্বাচনে ঘটে এক অবিস্মরণীয় ব্যালট বিপ্লব: মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় **২২৩টি আসন**, আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। কিন্তু গণরায়কে উপেক্ষা করে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল **আইয়ুব খান** সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সংবিধান বাতিল করেন, রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) নামক এক প্রহসনমূলক স্বৈরতন্ত্র চালু করেন।

৩. বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা (১৯৬৬ খ্রি.)

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কেন্দ্র পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার জন্য মাত্র একটি ডিভিশন সৈন্য রেখে বাকি সমস্ত শক্তি কাশ্মীরে নিয়োগ করেছিল। যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক **শেখ মুজিবুর রহমান** উত্থাপন করেন বাঙালির বাঁচার দাবি—**ঐতিহাসিক ছয় দফা**:

- **১ম দফা:** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামো হবে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম থাকবে।
- **২য় দফা:** কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল দুটি বিষয়—দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি; বাকি সমস্ত বিষয় প্রদেশগুলোর অধীনে থাকবে।
- **৩য় দফা:** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক কিন্তু অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, অথবা মুদ্রা এক থাকলে প্রদেশ থেকে অর্থ পাচার রোধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকবে।
- **৪র্থ দফা:** সকল প্রকার ট্যাক্স, কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে; কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদেশ প্রদান করবে।
- **৫ম দফা:** প্রদেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব থাকবে এবং প্রদেশসমূহ নিজস্ব বাণিজ্য চুক্তি করার অধিকারী হবে।
- **৬ষ্ঠ দফা:** আঞ্চলিক সংহতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য প্রদেশসমূহ নিজস্ব আধা-সামরিক বাহিনী (মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি) গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

ছয় দফা ছিল মূলত **বাঙালির স্বাধিকারের মহাসনদ (ম্যাগনা কার্টা)**। আইয়ুব খান ছয় দফাকে *“অস্ত্রের ভাষায় দমন”* করার হুমকি দেন এবং শেখ মুজিব সহ হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে বন্দি করেন। কিন্তু বাংলার প্রতিটি মানুষের অন্তরে ছয় দফা রূপ নেয় মুক্তির একমাত্র গন্তব্যে।

৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান

শেখ মুজিবকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে আইয়ুব জান্তা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে দায়ের করে কুখ্যাত **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা** (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য)। শেখ মুজিব এবং ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা ভারতের সাথে হাত মিলিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করেছেন।

এই ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালির ক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। ১৯৬৯ সালের শুরুতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে ঐতিহাসিক **১১ দফা আন্দোলন**, যা রূপ নেয় **১৯৬৯-এর অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থানে**। ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা **আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (আসাদ)** পুলিশের গুলিতে শহীদ হন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বন্দি অবস্থায় বীর সার্জেন্ট **জহুরুল হক**-কে গুলি করে হত্যা করা হলে সমগ্র বাংলা বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে ওঠে।

গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরদিন **২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯** ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ জনতার ঐতিহাসিক মহাসমাবেশে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে ভূষিত করেন এক অমর ও শাশ্বত উপাধিতে—**“বঙ্গবন্ধু”**। গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, যিনি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭০)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম–৩য় খণ্ড)*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- জাহান, রওনক (১৯৭২)। *পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)।
- সবহান, রেহমান (১৯৬৮)। *বেসিক ডেমোক্রেসিস অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মওদুদ আহমদ (১৯৭৯)। *বাংলাদেশ: এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান*। ইউপিএল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিকুণ্ড — ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৬।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-16-east-pakistan-language-movement-and-six-point-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

মুক্তির দ্বারপ্রান্তে — ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ব্যালট বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

মুক্তির দ্বারপ্রান্তে — ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ব্যালট বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

904 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৭: *চিত্র: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!"*

১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ—এই মাত্র ষোলটি মাস ছিল বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ। একদিকে প্রলয়ঙ্করী ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও পাকিস্তানি জান্তার চরম অমানবিকতা, অন্যদিকে ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিস্ময়কর গণরায়। কিন্তু ব্যালটের সেই ঐতিহাসিক বিজয়কে নস্যাৎ করতে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক চক্র যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়, তখনই গর্জে ওঠে সমগ্র বাংলাদেশ। শুরু হয় অভূতপূর্ব অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উচ্চারিত হয় বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী **৭ই মার্চের ভাষণ**—যা কার্যত পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়ে বাঙালি জাতিকে মুক্তির সশস্ত্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১. ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও পাকিস্তানের চরম অবহেলা

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর রাতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বিশ্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় 'ভোলা সাইক্লোন' আঘাত হানে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে। বিশ ফুটেরও বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা ও পটুয়াখালীর বিস্তীর্ণ জনপদ মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যায়। এক রাতেই প্রাণ হারায় আনুমানিক **পাঁচ লক্ষ নিরীহ মানুষ**।

এই জাতীয় মহাদুর্যোগের দিনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম বর্ণবাদী ও বিমাতাসুলভ রূপ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো যখন ত্রাণ নিয়ে ছুটে আসছিল, তখন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল **আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান** বেইজিং সফর শেষে ঢাকায় নেমে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে চলে যান। তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা সামরিক হেলিকপ্টারগুলো উদ্ধারকাজে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায় পাকিস্তানি জেনারেলরা। এই নারকীয় অবহেলায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবীণ জননেতা **মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী** পল্টনের জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন: *"আসসালামু আলাইকুম, পাকিস্তান!"*

২. ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন: ব্যালট বিপ্লব

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতের ওপর দাঁড়িয়ে **১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর** সমগ্র পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার পক্ষে বাংলার জনগণ যে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে, তা বিশ্ব সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়:

- **জাতীয় পরিষদ:** পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে জয়লাভ করে **১৬৭টি আসনে**। ফলে ৩১৩ আসনবিশিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু লাভ করেন নিরঙ্কুশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।
- **প্রাদেশিক পরিষদ:** পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে **২৮৮টি আসন**।
- **পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্র:** পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পায় ৮১টি আসন (মূলত পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে)।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানের বৈধ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা, সামন্ত প্রভু এবং ভুট্টোর সিন্ডিকেট কোনোভাবেই একজন বাঙালির কাছে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নিতে পারেনি।

৩. অধিবেশন স্থগিত ও ১ মার্চের বারুদ বিস্ফোরণ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সংসদ সদস্য ঢাকায় গেলে তাঁর ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে এবং তিনি হুমকি দেন: *"উধার তুম, ইধার হাম"* (তোমরা ওপারে থাকো, আমরা এপারে শাসন করব)।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই রেডিও ঘোষণার সাথে সাথে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে ঢাকা। কলকারখানা, অফিস-আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখো জনতা রাজপথে নেমে স্লোগানে আকাশ কাঁপিয়ে তোলে: *"বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো!"* বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক **অসহযোগ আন্দোলন**।

২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বিচারপতি, পুলিশ, সচিবালয়, ব্যাংক থেকে শুরু করে সমস্ত বেসামরিক প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন থেকে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনেতারা উত্তোলন করেন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা; ৩ মার্চ পল্টনে পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ইশতেহার।

৪. ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: মুক্তির মহাকাব্য

অসহযোগ আন্দোলনের সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করে **১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রোববার বিকেলে**। বাঁশের লাঠি, লোহার রড আর স্বাধীনতার দৃপ্ত শপথ নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমবেত হয় দশ লক্ষাধিক মুক্তিকামী মানুষ। মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র হেলিকপ্টার।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিব কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু দৃপ্ত পদক্ষেপে ডায়াসে উঠলেন। কোনো লিখিত কাগজ ছাড়াই একটানা ১৮ মিনিট ধরে তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন, তা ছিল একাধারে রণকৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং একটি জাতির মুক্তির মহাকাব্য:

> *“রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব—এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ! এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম! জয় বাংলা!”*
> — ***জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*** *(৭ই মার্চ ১৯৭১)*

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে একদিকে চার দফা শর্ত দিয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখলেন যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে গণহত্যা চালানোর আইনগত সুযোগ না পায়; অন্যদিকে প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার সুস্পষ্ট গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণকে **‘মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার’**-এ অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৫. প্রহসনের আলোচনা ও গণহত্যার নীলনকশা

বাঙালির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেখে ভীত ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করতে। পরে তাঁর সাথে যোগ দেন ভুট্টো। কিন্তু এই তথাকথিত আলোচনা ছিল কেবলই এক ধূর্ত প্রতারণা। পর্দার অন্তরালে তখন পিআইএ-র বিমানে করে শ্রীলঙ্কা ঘুরে হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও অস্ত্র ঢাকায় নামানো হচ্ছিল।

১৮ মার্চ মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী যৌথভাবে প্রণয়ন করেন ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার নীলনকশা—**অপারেশন সার্চলাইট**। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আলোচনার সমাপ্তি না টেনেই ইয়াহিয়া খান গোপনে করাচির উদ্দেশে বিমান ধরেন। ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী কালরাতের দিকে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)।
- রাঘবন, শ্রীনাথ (২০১৩)। *১৯৭১: আ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ*। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- সিসন ও রোজ (১৯৯০)। *ওয়ার অ্যান্ড সেসেশন: পাকিস্তান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ*। ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।
- রাজা, খাদিম হোসেন (২০১২)। *আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- আহমেদ, সালাহউদ্দীন (২০০৪)। *বাংলাদেশ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মুক্তির দ্বারপ্রান্তে — ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ব্যালট বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৭।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-17-1970-elections-and-historic-march-7-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ — অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা এবং লাল-সবুজের মহাবিজয়

মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ — অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা এবং লাল-সবুজের মহাবিজয়

1,005 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৮: *চিত্র: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর—৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন।*

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালনা করে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম বর্বরতম পরিকল্পিত সামরিক হত্যাযজ্ঞ—**অপারেশন সার্চলাইট**। বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পরবর্তী দীর্ঘ নয় মাস সমগ্র বাংলাদেশ পরিণত হয় এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত, দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রম এবং এক কোটি শরণার্থীর ত্যাগে রচিত হয় **মহান মুক্তিযুদ্ধ**। মেহেরপুরের আম্রকাননে গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বীর **মুক্তিযোদ্ধাদের** মরণপণ গেরিলা যুদ্ধ এবং বীর মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে **১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর** ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১. অপারেশন সার্চলাইট ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও স্বয়ংক্রিয় ভারী অস্ত্র নিয়ে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তারা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নারকীয় উল্লাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) এবং রোকেয়া হলে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করা হয় শত শত ঘুমন্ত ছাত্র ও কর্মচারীকে। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. আ.ন.ম. মformData, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।

একই সাথে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ চালানো হলে বীর বাঙালি পুলিশ সদস্যরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল দিয়ে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর এবং পুরান ঢাকার হিন্দু মহল্লাগুলোতে কামান ও মর্টারের গোলার আগুনে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে লুকিয়ে থাকা ব্রিটিশ সাংবাদিক **সাইমন ড্রিং** ভোরবেলা ধ্বংসস্তূপের ছবি তুলে লন্ডনের *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এ পাঠান, যা বিশ্ববাসীকে নাড়িয়ে দেয়: *“আল্লাহ ও অখণ্ড পাকিস্তানের নামে ঢাকা আজ এক ধ্বংসস্তূপ ও ভীতির নগরী... এক রাতেই হত্যা করা হয়েছে কমপক্ষে সাত হাজার মানুষকে।”*

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা

ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে পাকিস্তানি কমান্ডোদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে (রাত ১২টা ২০ মিনিটে) বঙ্গবন্ধু ইপিআরের বিশেষ ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ইংরেজিতে **স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা** পাঠান:

> *“ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি, যে যেখানেই থাকুন, যাহার যাহা কিছু আছে তাহাই লইয়া দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন। যতদিন না পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি হইতে বিতাড়িত হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হয়, ততদিন আপনাদের এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে হইবে। জয় বাংলা।”*
> — ***জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*** *(২৬শে মার্চ ১৯৭১)*

এই ঘোষণা ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান প্রথম পাঠ করেন এবং ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান পুনর্পাঠ করে সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানান।

২. ৭১-এর গণহত্যা ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার

পরবর্তী নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী সমগ্র বাংলায় পরিকল্পিত গণহত্যা পরিচালনা করে। **ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন**, দুই লক্ষাধিক নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন এবং এক কোটি মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ১৯৭১ সালের ১৩ জুন লন্ডনের *সানডে টাইমস* পত্রিকায় ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল কেবল একটি শব্দ: **“Genocide” (গণহত্যা)**—যা বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধকে নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রূপ দিতে ১৯৭১ সালের **১০ এপ্রিল গঠিত এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর)** আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)**। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, **সৈয়দ নজরুল ইসলাম**-কে উপ-রাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) এবং দূরদর্শী জননেতা **তাজউদ্দীন আহমদ**-কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দর্শন হিসেবে ঘোষণা করা হয়—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার।

Shakil Mahmud • Research Monograph

৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ-কমান্ডোদের অপারেশন জ্যাকপট

প্রধান সেনাপতি **জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী**-র নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশকে **১১টি সেক্টরে** বিভক্ত করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিত ব্রিগেড হিসেবে জেড-ফোর্স, কে-ফোর্স ও এস-ফোর্স গঠিত হয়। প্রায় এক লক্ষ ছাত্র, তরুণ, কৃষক ও সেনাসদস্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বীর **মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তি বাহিনী**।

বর্ষার প্লাবিত নদী ও কর্দমাক্ত ধানক্ষেতে গেরিলারা পাকিস্তানি বাহিনীকে দিশেহারা করে তোলে:

- **অপারেশন জ্যাকপট (১৫ আগস্ট ১৯৭১):** মধ্যরাতে লিম্পেট মাইন বুকে বেঁধে খালি গায়ে পানির নিচ দিয়ে সাঁতরে গিয়ে ১৪৮ জন বাঙালি নৌ-কমান্ডো একযোগে চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে হামলা চালান। এক রাতেই ডুবিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬টি যুদ্ধজাহাজ ও রসদবাহী জাহাজ। এই দুঃসাহসিক অপারেশনে পাকিস্তানি সামরিক রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যায়।
- **ঢাকার ক্র্যাক প্লাটুন:** দখলদারদের নাকের ডগায় রাজধানী ঢাকার ভেতরে গেরিলা হামলা চালায় তরুণ ছাত্রদের আত্মঘাতী দল ক্র্যাক প্লাটুন। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, বিদ্যুৎ সাবস্টেশন ও সেনা চেকপোস্টে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তারা প্রমাণ করে যে ঢাকা পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য নিরাপদ নয় (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* এবং শহীদ শফি ইমাম রুমীর বীরত্বে যা অমর হয়ে আছে)।

৪. বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ও ১৬ই ডিসেম্বরের মহান বিজয়

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালালে মুক্তিযুদ্ধ রূপ নেয় **ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে**। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ড গঠিত হয় **মিত্রবাহিনী** নামে, যার নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। আকাশ ও স্থলপথে যৌথবাহিনীর ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে পাকিস্তানি প্রতিরোধ।

নিশ্চিত পরাজয় আসন্ন জেনে পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলীর নীলনকশায় আল-বদর বাহিনী ঘটায় শতাব্দীর সবচেয়ে নৃশংস অপরাধ—**বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ**। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার বাসা থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের—মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, ড. আলীম চৌধুরী, সেলিনা পারভীন সহ শত শত মনীষীকে। রায়েরবাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমিতে তাঁদের হাত-পা বেঁধে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধা ও মননে পঙ্গু করার হীন উদ্দেশ্যে।

অবশেষে আসে সেই রক্তিম সূর্যোদয়ের দিন—**১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১**। চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল **এ. এ. কে. নিয়াজী** মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। মুক্তি বাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এয়ার কমোডর এ. কে. খন্দকার।

৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে নতশিরে যুদ্ধবন্দি হয়—যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো একক সামরিক বাহিনীর সর্ববৃহৎ প্রকাশ্য আত্মসমর্পণ। লক্ষ কোটি মানুষের অশ্রুভেজা কণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনিত হয় “জয় বাংলা!”—ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে চিরস্থায়ী গৌরবে উদিত হয় স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- বাস, গ্যারি জে. (২০১৩)। *দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড আ ফরগটেন জেনোসাইড*। আলফ্রেড নফ।
- মাসকারেনহাস, অ্যান্থনি (১৯৭১)। *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ*। বিকাশ পাবলিকেশন্স, দিল্লি।
- ইসলাম, মেজর রফিকুল (১৯৭৪)। *এ টেল অব মিলিয়নস: বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ১৯৭১*। ঢাকা।

- খন্দকার, এ. কে. (২০১৪)। *১৯৭১: ভেতরে বাইরে*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
- ইমাম, জাহানারা (১৯৮৬)। *একাত্তরের দিনগুলি*। সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ — অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা এবং লাল-সবুজের মহাবিজয়"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৮।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-18-liberation-war-1971-and-victory-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ঊনবিংশ খণ্ড

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম (১৯৭২–২০০০-এর দশক)

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম (১৯৭২–২০০০-এর দশক)

912 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৯: *চিত্র: সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ—স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেনের অনন্য নকশায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধার চিরন্তন প্রতীক।*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত স্বাধীনতার রক্তিম প্রভাত বাঙালির জন্য নিয়ে এসেছিল যেমন অপার গর্ব ও আনন্দ, তেমনই এক চরম অস্তিত্ব রক্ষার চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ শেষে বাংলাদেশ তখন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে—শূন্য রাজকোষ, বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাইন পোঁতা সমুদ্রবন্দর এবং এক কোটি গৃহহারা ছিন্নমূল শরণার্থী। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের এক মহাকাব্যিক সংগ্রাম। কিন্তু পরবর্তী তিন দশক দেশকে অতিক্রম করতে হয়েছে একের পর এক রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি ও রাজনৈতিক ঝড়: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সপরিবারে জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড, জিয়া ও এরশাদের দীর্ঘ সামরিক শাসন, ১৯৯০-এর ঐতিহাসিক স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান এবং একই সাথে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের হাত ধরে গ্রামীণ অর্থনীতির এক অবিশ্বাস্য নীরব বিপ্লব।

১. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও ১৯৭২-এর সংবিধান

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে **১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি** স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**। রেসকোর্স ময়দানে অশ্রুসিক্ত নয়নে লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এমন এক দেশের, যাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা উপহাস করে বলত “তলাবিহীন ঝুড়ি” (Bottomless Basket)।

মাত্র দশ মাসের এক অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ের মধ্যে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে প্রণীত হয় আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবিক সংবিধান—**১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**। এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূল স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়:

- **জাতীয়তাবাদ:** ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ।
- **সমাজতন্ত্র:** শোষণমুক্ত ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও সম্পদের সুষম বণ্টন।
- **গণতন্ত্র:** মৌলিক মানবাধিকার, আইনের শাসন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার।
- **ধর্মনিরপেক্ষতা:** সকল ধর্মের সমান অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সহাবস্থান।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের মার্চের মধ্যেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমস্ত সেনাকে স্বদেশে ফেরত পাঠান, মাত্র তিন বছরে বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায় করেন এবং ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে অধিষ্ঠিত করেন।

২. যুদ্ধোত্তর সংকট ও ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ট্র্যাজেডি

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি যখন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ১৯৭৪-এর প্রলয়ঙ্করী বন্যার কারণে চরম দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে, তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দমনে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের শুরুতে একদলীয় শাসনকাঠামো **বাকশাল** (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন।

কিন্তু এই সামাজিক পরিবর্তনের সুফল ঘরে তোলার পূর্বেই নেমে আসে ইতিহাসের সবচেয়ে নারকীয় কালো রাত। **১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের** কালরাতে একদল বিপথগামী সেনাসদস্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা চালায়। ঘাতকরা সপরিবারে হত্যা করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও দশ বছরের নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকে। বিদেশে অবস্থানের কারণে অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান কেবল তাঁর দুই কন্যা—শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

এর মাত্র আড়াই মাস পর ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী **জাতীয় চার নেতাকে**—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে।

৩. সামরিক শাসন: জিয়াউর রহমান থেকে এইচ এম এরশাদ

১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনার পর অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন মেজর জেনারেল **জিয়াউর রহমান**। জিয়া সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজন করেন, *“বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ”*-এর ধারণা প্রবর্তন করেন, প্রতিষ্ঠা করেন **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)** এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা **সার্ক (SAARC)** গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১৯৮২ সালের মার্চে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল **হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ**। এরশাদের দীর্ঘ আট বছরের শাসনামলে তিনি স্থানীয় সরকারে 'উপজেলা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন এবং সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন, কিন্তু তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দিন দিন তীব্রতর হতে থাকে।

৪. ১৯৯০-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার

স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আশির দশক জুড়ে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী **শেখ হাসিনা** (১৫ দলীয় জোট) এবং বিএনপি চেয়ারপারসন **বেগম খালেদা জিয়া** (৭ দলীয় জোট)। ১৯৯০ সালের শেষভাগে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে এই আন্দোলন রূপ নেয় **১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে**।

নাজির উদ্দিন জেহাদ এবং চিকিৎসক নেতা ডা. শামসুল আলম খান মিলনের আত্মত্যাগে সমগ্র বাংলাদেশ অচল হয়ে পড়ে। অবশেষে **১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর** স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধান বিচারপতি **সাহাবুদ্দীন আহমদ**-এর নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় অবাধ ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে পুনরায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. তৃণমূলের আর্থ-সামাজিক বিস্ময়: পোশাক শিল্প ও ক্ষুদ্রঋণ

নব্বইয়ের দশকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দেয়:

- **তৈরি পোশাক শিল্পের (RMG) মহাবিপ্লব:** আশির দশকে দেশ গার্মেন্টসের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ পরিণত হয় চীনের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশে। এই খাতে কর্মসংস্থান হয় চল্লিশ লক্ষাধিক মানুষের—যার সিংহভাগই গ্রামীণ নারী। পোশাক শিল্প বাংলার রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মমর্যাদায় এক বিশাল সামাজিক নীরব বিপ্লব ঘটায়।
- **ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক:** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক **ড. মুহাম্মদ ইউনূস** প্রমাণ করেন যে দরিদ্র মানুষ ঋণখেলাপি নয়, বরং জামানতহীন ক্ষুদ্রঋণ তাদের দারিদ্র্য জয়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত **গ্রামীণ ব্যাংক** বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয় এবং ২০০৬ সালে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে লাভ করেন শান্তিতে **নোবেল পুরস্কার**। একই সাথে স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রতিষ্ঠিত **ব্র্যাক (BRAC)** পরিণত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায়।
- **বাংলাদেশ প্যারাডক্স:** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানব উন্নয়নে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে শিশুমৃত্যু হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর সমতা অর্জনে বিশ্বে এক রোল মডেলে পরিণত হয়।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- লিফশুলৎজ, লরেন্স (১৯৭৯)। *বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রেভোলিউশন*। জেড প্রেস, লন্ডন।
- মনিরুজ্জামান, তালুকদার (১৯৮২)। *দ্য বাংলাদেশ রেভোলিউশন অ্যান্ড ইটস আফটারম্যাথ*। ইউপিএল।
- ইউনূস, মুহাম্মদ (১৯৯৯)। *ব্যাংকার টু দ্য পুওর*। পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, নিউ ইয়র্ক।
- সেন, অমর্ত্য ও জঁ দ্রোজ (২০১৩)। *ভারত: উন্নয়ন ও বঞ্চনা*। আনন্দ পাবলিশার্স।
- আহমেদ, মওদুদ (১৯৯৫)। *গণতন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*। ইউপিএল।



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম (১৯৭২–২০০০-এর দশক)"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ১৯। https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-19-nation-building-and-democratic-journey-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

মেগা-অবকাঠামো, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং ২০২৬-এর দিগন্ত

মেগা-অবকাঠামো, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং ২০২৬-এর দিগন্ত

850 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ২০: *চিত্র: প্রমত্তা পদ্মার ওপর ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ স্বপ্নের পদ্মা বহুমুখী সেতু—স্ব-অর্থায়নে নির্মিত এক অনন্য প্রকৌশল কীর্তি, যা ২০২৬ সালের সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার প্রতীক।*

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের সমাপ্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা আজ প্রযুক্তিগত রূপান্তর, সুবিশাল মেগা-অবকাঠামো এবং এক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক নবজন্মের ঐতিহাসিক মোহনায় দণ্ডায়মান। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ অর্জন করেছে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অতিক্রম করেছে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের সূচক এবং নিজস্ব অর্থায়নে প্রমত্তা পদ্মার বুকে গড়ে তুলেছে **পদ্মা বহুমুখী সেতু** ও মেট্রোরেলের মতো আধুনিক যুগের বিস্ময়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী শাসন ও ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে **জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে**। স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসানের পর নোবেল শান্তি বিজয়ী **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস**-এর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আজ **২০২৬ ও তার পরবর্তী দিগন্তের** পানে তাকিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, প্রযুক্তি বিপ্লব এবং ইনসাফভিত্তিক এক নতুন গণতান্ত্রিক সভ্যতার স্বপ্ন বুনছে।

১. অর্থনৈতিক রূপান্তর ও মেগা-অবকাঠামোর জয়যাত্রা

২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দ্রুত বিকাশমান নিম্ন-মধ্যম আয়ের শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রবৃদ্ধির পেছনে ছিল তিনটি প্রধান চালিকাশক্তি: ৪৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত, প্রবাসীদের পাঠানো ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এবং কৃষকদের ঘামে অর্জিত খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

এই আত্মবিশ্বাস মূর্ত হয়ে ওঠে বিশ্বমানের **মেগা-অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর** সফল বাস্তবায়নে:

- **স্বপ্নের পদ্মা বহুমুখী সেতু:** আধুনিক বাংলাদেশের সবচেয়ে গৌরবময় জাতীয় অর্জন। আমাজন নদীর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রমত্তা নদী পদ্মার ওপর ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতল এই স্টিল ট্রাস সেতু নির্মাণ করা হয়েছে সম্পূর্ণ **বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে** (২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক সরে যাওয়ার পর)। ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধনের মাধ্যমে এই সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে সরাসরি রাজধানী ঢাকার সাথে যুক্ত করে এবং জাতীয় জিডিপিতে বার্ষিক ১.২ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখছে।
- **ঢাকা মেট্রোরেল (MRT Line 6):** বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরী ঢাকায় দ্রুতগতির পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎচালিত গণপরিবহনের এক নতুন যুগের সূচনা।
- **বঙ্গবন্ধু টানেল (কর্ণফুলী টানেল):** দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সমুদ্রতলদেশ দিয়ে নির্মিত সড়ক টানেল, যা চট্টগ্রামকে “ওয়ান সিটি টু টাউন” মডেলে গড়ে তুলেছে।
- **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর:** ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক জ্বালানি এবং বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার মহাসড়কে যুক্ত করেছে।

২. রোহিঙ্গা মানবিক আশ্রয়: মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত (২০১৭–বর্তমান)

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হয়ে যখন লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম পালিয়ে আসছিল, তখন বাংলাদেশ উন্মুক্ত করে দেয় তার সীমান্ত। এক অভূতপূর্ব মানবিক উদারতায় বাংলাদেশ আশ্রয় দেয় **সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষকে**।

বর্তমানে কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়ার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে আছে **১১ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী**—যা বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম শরণার্থী শিবির। বিশাল অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে মানবতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৩. জুলাই-আগস্ট ২০২৪: ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান

ভৌত অবকাঠামো দৃশ্যমান হলেও বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো চরম সংকটের মুখে পড়ে। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে ভোটাধিকার হরণ, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিচার বিভাগের দলীয়করণ এবং ব্যাংকিং খাত থেকে লক্ষ কোটি টাকার অর্থ পাচারের ফলে সমাজে চরম ক্ষোভের জন্ম হয়।

এই বিস্ফোরণ ঘটে **২০২৪ সালের জুলাই মাসে**। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কারের দাবিতে *বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন*-এর ব্যানারে শুরু হওয়া অহিংস আন্দোলনটি রূপ নেয় এক মহাবিপ্লবে, যখন পুলিশ ও দলীয় সন্ত্রাসীরা নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। ১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে বীর **আবু সাঈদ**-এর শাহাদাত এবং ঢাকায় ছাত্রনেতা **মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ**-এর আত্মত্যাগ সমগ্র জাতিকে স্তব্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কারফিউ, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ও বুলেটের ভয় উপেক্ষা করে কোটি জনতা রাজপথে নেমে আসে। ৫ আগস্ট ২০২৪ লক্ষ লক্ষ জনতার *লং মার্চ টু ঢাকা*-র মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান এবং সমাপ্তি ঘটে আওয়ামী লীগের টানা পনেরো বছরের শাসনের।

৪. ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও ২০২৬-এর ভবিষ্যৎ দিগন্ত

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস**।

নতুন সরকার রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজাতে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে—যার মূল লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতে যে কোনো ফ্যাসিবাদের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে এক টেকসই, ইনসাফভিত্তিক ও মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

২০২৬ ও ভবিষ্যতের মহাদিগন্ত

২০২৬ সালের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ তার হাজার বছরের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এক নতুন যুগের পথে অগ্রসর হচ্ছে:

- **জলবায়ু অভিযোজন ও বদ্বীপ পরিকল্পনা:** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সরাসরি ঝুঁকিতে থাকা এই ডেল্টা জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বিশ্বকে পথ দেখাবে নিজস্ব প্রকৃতিভিত্তিক অভিযোজনের মাধ্যমে।
- **জনমিতিক লভ্যাংশ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):** দেশের ৬৫ শতাংশ তরুণ জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তি, ফ্রিল্যান্সিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বমানের দক্ষতায় রূপান্তর করাই আগামী দশকের প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য।
- **গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও সার্বজনীন ইনসাফ:** বাংলার ২৫০০ বছরের ইতিহাস—শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড়, পালদের গণতান্ত্রিক নির্বাচন, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান—একটি শাশ্বত সত্যই প্রমাণ করেছে: এই মাটির মানুষ কখনো দীর্ঘস্থায়ী দাসত্ব, অন্যায় বা ফ্যাসিবাদের কাছে মাথা নত করে না।

লালমাই পাহাড়ের প্রাচীন পাথুরে হাতিয়ার থেকে শুরু করে পদ্মার বুক চেরা আধুনিক মেগা-ব্রিজ; মেগাস্থিনিসের দেখা গঙ্গারিডাই হস্তীবাহিনী থেকে শুরু করে ২০২৬-এর প্রযুক্তিপ্রজন্ম—বাংলার ইতিহাস হলো মানুষের অমরত্ব, নদীমাতৃক সংস্কৃতি এবং মুক্তির চিরন্তন জয়গান।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- বিশ্বব্যাংক (২০২২)। *বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট: নেভিগেটিং দ্য নিউ নরমাল*। ওয়াশিংটন ডিসি।
- জাতিসংঘ (২০২১)। *রিপোর্ট অন দ্য ট্রায়েনিয়াল রিভিউ অব এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন (বাংলাদেশ)*। ইউএন।
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (২০২৪)। *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ: রিফর্মস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি*। লন্ডন।
- সবহান, রেহমান (২০১৬)। *চ্যালেঞ্জিং দ্য ইনজাস্টিস অব পভার্টি*। সেজ পাবলিকেশন্স।
- আলী, ড. রফিক মোহাম্মদ (২০২৩)। *পদ্মা ব্রিজ: ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইকোনমিক ট্রানস্ফরমেশন*। ঢাকা।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মেগা-অবকাঠামো, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং ২০২৬-এর দিগন্ত"। বাংলার ইতিহাস, খণ্ড ২০।
https://shakilmahmud.com/bn/history-of-bengal-part-20-modern-transformation-and-2026-horizon-bn/

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

Majumdar, R. C. (1943). *The History of Bengal (Vol. 1: Hindu Period)*. University of Dacca.

Sarkar, Jadunath (1948). *The History of Bengal (Vol. 2: Muslim Period, 1200–1757)*. University of Dacca.

Eaton, Richard M. (1993). *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760*. University of California Press.

Chakrabarty, Dipesh (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton University Press.

Shakil Mahmud • Research Monograph

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

❖

Shakil Mahmud

গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

COLOPHON

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com